বাঘের চোখ

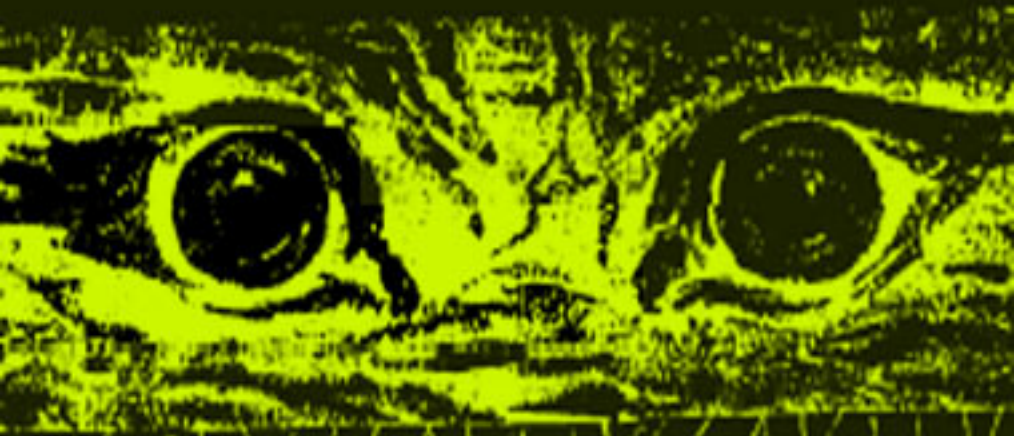

লীলা মজুমদার

বাঘের চোখ

লীলা মজুমদার

পেনেটিতে

পেনেটিতে, একেবারে গঙ্গার ধারে, আমার বড়ো মামা একটা বাড়ি কিনে বসলেন। শুনলাম বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব তাই কেউ সেখানে থাকতে চায় না। সেইজন্য বড়ো মামা ওটাকে খুব সস্তাতেই পেয়েছিলেন।

যাই হোক, বিয়ে-টিয়ে করেননি, আপত্তি করবার লোকও ছিল না। মেজো মাসিমা একবার বলেছিলেন বটে, 'নাই-বা কিনলে দাদা, কিছু নিশ্চয়ই আছে, নইলে কেউ থাকে না কেন?'

বড়ো মামা রেগে-মেগে বাড়ির কাগজপত্র সই করবার আগে ওঁদের কুস্তির আড্ডার দু-জন ষণ্ডাকে নিয়ে সেখানে দিব্য আরামে দু-রাত কাটিয়ে এলেন। ষণ্ডাদের অবিশ্যি সবকথা ভেঙে বলা হয়নি। তারা দু-বেলা মুরগি খাবার লোভে মহাখুশি হয়েই থাকতে রাজি হয়েছিল। পরে আড্ডায় ফিরে এসে যখন বড়ো মামা ব্যাপারটা খুলে বলেছিলেন তখন তারা বেজায় চটে গিয়েছিল। 'যদি কিছু হত দাদা? গায়ের জোর দিয়ে তো ওনাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যেত না!'

দু-মাস পরে বড়ো মামা সেখানে রেগুলার বসবাস শুরু করে দিলেন। সঙ্গে গেল বঙ্কু ঠাকুর, তার রান্না যে একবার খেয়েছে সে জীবনে ভোলেনি; আর গেল নটবর বেয়ারা, তার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, রোজ সকালে-বিকেলে আধ ঘণ্টা করে দুটো আধমনি মুগুর ভাঁজে। আর ঝগড়ু জমাদার, সে চার-পাঁচ বার জেল খেটে এসেছে গুন্ডামি-টুন্ডামির জন্য। এরা কেউ, শুধু ভূত কেন, ভগবানেও বিশ্বাস করে না।

আমরা বরানগরে ছিলাম, আমি ক্লাস নাইনে পড়ছি। এমন সময় বাবা পাটনা বদলি হয়ে গেলেন আর আমার স্কুল নিয়েই হল মুশকিল। বড়ো মামা তাই শুনে বললেন, 'কুছ্ পরোয়া নেই, আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, এমন কিছু দূরও পড়বে না। ব্যাটা বঙ্কুর রান্না খাবে আর আমিও আমার নতুন কবিতাগুলো শোনাবার লোক পাব, বঙ্কুরা তো আজকাল আর শুনতে চায় না। ভালোই হল।'

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। মা-রা যেদিন সকালে পাটনা চলে গেলেন, আমার জিনিসপত্র বড়ো মামার ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল, আর আমিও সারাদিন স্কুল করে বিকেলে গিয়ে সেখানে হাজির হলাম।

মনটা তেমন ভালো ছিল না, মা-রাও চলে গেছেন আবার আমাদের ক্লাসের জগু আর ভুটে বলে দুই কাপ্তেন কিছুদিন থেকে এমনি বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল যে, স্কুলে টেকা দায় হয়ে

উঠছিল। আগে ওরাই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল, কিন্তু পুজোর ছুটির সময় সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ওরা এমন প-এ আকার ছোটোলোকের মতো ব্যবহার আরম্ভ করেছিল যে, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন ওরাই হলেন ফুটবলের ক্যাপ্টেন, ক্লাবের সেক্রেটারি। সে দিনও ওদের সঙ্গে বেশ একটা কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে; সে আবার অঙ্ক ক্লাসে। আমার একার দোষ নয়, কিন্তু ধরা পড়ে বকুনি খেলাম আমিই। ওরা দেখলাম খাতার আড়ালে ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসছে।

বাড়ি এসেও মনটা একটু খারাপই ছিল। একেবারে জলের মধ্যে থেকে ঘাটের সিঁড়ি উঠে গেছে বারান্দা পর্যন্ত। বিশাল বিশাল ঘর, ঝগড়ু আর নটবর তকতকে করে রেখেছে। প্রায় সবগুলোই খালি, শুধু নীচের তলায় বসবার ও খাবার ঘরে আর দোতলায় দুটো শোবার ঘরে বড়ো মামা কয়েকটা দরকারি আসবাব কিনে সাজিয়েছেন।

কেউ কোথাও নেই। বড়ো মামাও কোথায় বেরিয়ে গেছেন। নীচে থেকে বঙ্কুর রান্না লুচি-আলুরদম খেয়ে উপরে গেলাম। বই রেখে, আমার ঘরের সামনের চওড়া বারান্দা থেকে দেখি বাগানময় ঝোপঝাপ; আম গাছ, কাঁঠাল গাছও গোটাকতক আছে। গঙ্গার ধার দিয়ে জবা ফুলের গাছ দিয়ে আড়াল-করা একটা সরু রাস্তা একেবারে নদীর কিনারা ঘেঁষে চলে গেছে। সেখানে তিনজন মাঝি গোছের লোক মাছ ধরার ছিপ সারাচ্ছে। একজন বুড়ো আর দু-জন আমার চেয়ে একটু বড়ো হবে। ওখানকারই লোক বোধ হয়। আমাকে দেখতে পেয়ে তারা নিজের থেকেই ডাকল। দেখতে দেখতে বেশ ভাব জমে গেল। ওরা বললে, পিছন দিকের পুকুরে আমাকে মাছ ধরা শেখাবে, শনিবার নদীতে জাল ফেলবে, নিশ্চয় নিশ্চয় যেন আসি। বুড়োর নাম শিবু, ছেলে দুটো ওর ভাইপো, সিজি আর গুজি।

বেশ লোকগুলো। বাড়ির মধ্যে আসত-টাসত না, চাকরবাকরদের এড়িয়ে চলত, কিন্তু আমার সঙ্গে খুব দহরম-মহরম হয়ে গেল। আমাকে সাপ কামড়ানোর ওষুধ, বিছুটি লাগার ওষুধ এইসব শিখিয়ে দিল। আমাদের বাগানেই পাওয়া যায়।

মামা মাঝে মাঝে খুব রাত করে বাড়ি ফিরত। আর দোতলায় একা একা আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকতাম। শিবুদের কাছে সেকথা জানাতেই, যে দিনই মামা বেরোতেন, সে দিনই ওরা জলের পাইপ বেয়ে উপরে উঠে, বারান্দায় বসে আমার সঙ্গে কত যে গল্প করত তার ঠিক নেই। সব মাঝিদের গল্প, ঝড়ের কথা, নৌকাডুবির কথা, কুমির আসার কথা, হাঙর মারার কথা, সমুদ্রের কথা।

ওদিকে স্কুলের ঝগড়া বাড়তে বাড়তে এমন হল যে, ওই জগু, ভুটে, আর নেলে বলে ওদের যে এক শাকরেদ জুটেছে, এই তিন জনকে অন্তত আচ্ছা করে শিক্ষা না দিলে চলে না। শিবু বললে, 'বাবু, এইখানে ডেকে এনে সবাই মিলে কষে পিটুনি লাগাই।'

বললাম, 'না রে, শেষটা ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দেবে। তার চেয়ে এখানে এনে এমনি ভূতের ভয় দেখাই যে, বাছাধনদের চুল-দাড়ি সব খাড়া হয়ে উঠবে।' তাই শুনে ওরা তিন জনেই হেসেই লুটোপুটি।

আমি বললাম, 'দেখ্, তোদের তিন জনকে কিন্তু ভূত সাজতে হবে আর আমি ওদের ভুলিয়ে ভালিয়ে আনব। তোদের সব সাজিয়ে-গুজিয়ে দেব।'

'অ্যাঁ! সেজিয়ে-গুজিয়ে দেবেন কেনে বাবু? রংটং মেখিয়ে দেবার দরকার হবে না। তিনটে চাদর দেবেন। আমরা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে, গঙ্গার ধারে ঝোপের মধ্যে এমনি এমনি করে

হাত লাড়তে থাকব আর ওঁ ওঁ শব্দ করব, দেখবেন ওনাদের পিলে চমকে যাবে।' ছেঁড়া চাদর ধুতি যা পেলাম তিনটে দিয়ে দিলাম। সত্যি ওদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না! ভালোই হবে, তাহলে আমাকে কেউ সন্দেহও করবে না, বাড়িটার একটা অপবাদ তো আছেই।

শুক্রবার ইস্কুলে গিয়ে জগু ভুটেদের সঙ্গে কথা বন্ধ করলাম। বাবা! ওদের রাগ দেখে কে! 'কী রে, হতভাগা, ভারি লাট সায়েব হয়েছিস যে? কথা বলছিস না যে বড়ো?'

বললাম, 'মেয়েদের সঙ্গে আমি বড়ো-একটা কথা বলি না। ব্যাচেলর মামার শিক্ষা।' তারা তো রেগে কাঁই, 'মেয়েদের সঙ্গে মানে? মেয়েদের আবার কোথায় দেখলি?'

বললাম, 'যারা ভূতের ভয়ে আমাদের বাড়ি যায় না, তাদের সঙ্গে মেয়েদের আবার কী তফাত?'

জগু রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলল, 'যা মুখে আসবে, খবরদার বলবি না, গুপে।'

'এক-শো বার বলব, তোমরা ভীতু, কাপুরুষ, মেয়েমানুষ।' জগু আমাকে মারে আর কী! শুধু অঙ্কের মাস্টারমশাই এসে পড়লেন বলে বেঁচে গেলাম।

স্কুল ছুটির সময় ভুটে পিছন থেকে এসে আমার কানে কানে বললে, 'সন্ধ্যে বেলা সাতটার সময় তোমাদের বাড়ির বাগানে আধ ঘণ্টা ধরে আমরা বেড়াব। দেখি তোমাদের ভূতের দৌড় কতখানি! হুঁ, আমাদের চিনতে এখনও তোমার ঢের বাকি আছে।'

আমি তো তাই চাই; শিবুরা আজকের কথাই বলে রেখেছিল।

বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরলাম, ওদের দেখতে পেলাম না। একটু একটু নার্ভাস লাগছিল, যদি ভুলে যায়। নদীর ধারে একটা ঝোপের পিছন থেকে গুজি ডেকে বলল, 'বাবু, সব ঠিক আছে আমাদের।' প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই জগু, ভুটে, নেলো তিন কাপ্তেন এসে হাজির।

বড়ো মামা বেরোচ্ছিলেন, ওদের দেখে আমাকে বললেন, 'বন্ধুদের কেষ্টনগরের মিষ্টিটিষ্টি দিস, সব একা একা খেয়ে ফেলিস না যেন।' কথাটা যেন না বললেই হত না। ওরা তো হেসেই গড়াগড়ি, যেন ভারি রসিকতা হল।

বড়ো মামা গেলে, খাওয়া-দাওয়া সেরে বাগানে গেলাম। এক্ষুনি বাছারা টের পাবেন! চারিদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটু একটু চাঁদের আলোতে সব যেন কীরকম ছায়া ছায়া দেখাচ্ছে, আমারই গা ছমছম্ করছে। গল্প করতে করতে ওদের গঙ্গার ধারের সেই সরু রাস্তাটাতে নিয়ে এলাম। বাড়ি থেকে এ জায়গাটা আড়াল করা। পথের বাঁক ঘুরতেই, আমার সুদ্ধু গায়ে কাঁটা দিল— ঝোপের পাশে তিনটে সাদা মূর্তি! মাথা মুখ হাত সব ঢাকা, আবার হাত তুলে তুলে যেন ডাকছে আর অদ্ভুত একটা ওঁ ওঁ শব্দ! একটু একটু হাসিও পাচ্ছিল।

জগুরা এক মিনিটের জন্য ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে, 'তবে রে হতভাগা! চালাকি করবার জায়গা পাসনি!' বলে ছুটে গিয়ে চাদরসুদ্ধ মূর্তিগুলোকে জাপটে ধরল।

তার পরের কথা আমি নিজের চোখে দেখেও যখন বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমরা আর কী করে করবে? ছোঁবামাত্র মূর্তিগুলো যেন ঝুরঝুর করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, শুধু চাদর তিনটে মাটিতে পড়ে গেল।

জগু, ভুটে, নেলোও তক্ষুনি মূর্ছা গেল।

আমি পাগলের মতো, 'ও শিবু, ও সিজি, ও গুজি' করে ছুটে বেড়াতে লাগলাম। গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে ঠান্ডা বাতাস বইতে লাগল আর গোলযোগ শুনে বঙ্কু, নটবর আর ঝগ্ডু হল্লা করতে করতে এসে হাজির হল। ওরা জগুদের তুলে, ঘরে নিয়ে গিয়ে, চোখে মুখে জল দিল। আমার গায়ে মাথায়ও মিছিমিছি এক বালতি জল ঢালল।

মামাকেও পাড়া থেকে ডেকে আনা হল। এসেই আমাকে কী বকুনি!

'বল লক্ষ্মীছাড়া, চাদর নিয়ে গিয়েছিলি কেন?'

যত বলি শিবু-সিজি-গুজির কথা, কেউ বিশ্বাস করে না।

'তারা আবার কে? এতদিন আছি, কেউ তাদের কোনোদিনও দেখেনি শোনেনি; এ আবার কী কথা? আন তাহলে তাদের খুঁজে।' কিন্তু তাদের কি আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায়? তারা তো আমার চোখের সামনে ঝুরঝুর করে কর্পূরের মতো উবে গেছে।

আহিরিটোলার বাড়ি

আহিরিটোলা কোথায় জান তো? সেখানে গঙ্গার ধারে আমার পূর্বপুরুষদের একটা মস্ত বাড়ি আছে। সেখানে কেউ থাকে না। দরজা-জানলা ঝুলে রয়েছে, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, দেয়ালে সব ইট বেরিয়ে পড়েছে। শুধু ইঁদুর বাদুড়ের বাস, আর সব জায়গায় একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ। বাড়িটা বাবার ঠাকুরদার ঠাকুরদা কোম্পানির আমলে তৈরি করেছিলেন, কলকাতা শহরই তখন সবে তৈরি হচ্ছে। দিব্যি চক-মেলানো দোমহলা বাড়ি, দেয়ালে সব জং ধরে-যাওয়া চিত্র-টিত্র করা, বিরাট পাথরের সিঁড়ি। টাকারও আর তাঁদের অভাব ছিল না, কীসব চোরাকারবার চলত; তখনকার দিনে অত আইন-আদালতেরও হাঙ্গামা ছিল না। মোট কথা, বাবার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ভয়ংকর ধনী লোক ছিলেন। প্রকাণ্ড জুড়ি-গাড়ি ছিল, তাতে চারটে কালো কুচকুচে ঘোড়া জোড়া হত, বাড়ির পিছন দিকে বিশাল আস্তাবল ছিল। সেসব কবে বিক্রি হয়ে গেছে, তার জায়গায় তিনতলা সব বাড়ি হয়ে, সেগুলো পর্যন্ত ভেঙেচুরে যাচ্ছে। সেবার প্রি-টেস্টে অঙ্কে পনেরো পেলাম। তাই নিয়ে বাড়িময় সে যে কীরকম হইচই লেগে গেল সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বাবা পর্যন্ত এমন কাণ্ড আরম্ভ করলেন যে, শেষ অবধি বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলাম। কাউকে কিছু না বলে, সন্ধ্যে বেলায় কয়েকটা কাপড় জামার পুঁটলি কাঁধে নিয়ে, ঘড়ি কিনবার জমানো টাকাগুলো পকেটে পুরে, একেবারে আহিরিটোলার বাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

সেখানে আলোটালো নেই, রাস্তার আলো এসে যা একটু ভাঙা দরজা জানলা দিয়ে ঢুকছে, অদ্ভুত সব ছায়া পড়ছে। সামনের দরজায় তালা মারা। কিন্তু জানলায় শিক নোনা ধরে ভেঙে গেছে, ঢুকতে কোনো অসুবিধা হল না। একটু যে ভয় করছিল না তাও নয়, আর কতরকম শেডের যে অন্ধকার হয়, তাই দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। খিদেও পেয়েছে প্রচুর, আবার রাগও হয়েছে। নীচের তলাটা কেমন যেন ঘুপসিপানা, পুঁটলি বগলে ধুলোমাখা সিঁড়ি দিয়ে দুমদুম করে উপরতলায় উঠে যাচ্ছি। এমন সময় সিঁড়ির ঠিক উপর থেকে কে বলল, 'আহা। তোদের জ্বালায় কি সন্ধ্যে বেলাতেও হাত-মুখ ধুয়ে আলবোলাটা নিয়ে একটু চুপ করে বসা যাবে না? সারাদিন শুধু দাও, দাও, দাও, দাও, এটা নেই, ওটা নেই, এটা চাই, ওটা চাই, এবার একটু ক্ষান্তি দে।' ভুরভুর করে নাকে একটা ধূপধুনোর সঙ্গে গোলাপজল আর ভালো তামাকের গন্ধ এল। চেয়ে দেখি তারার আলোকে সিঁড়ির উপর একজন বুড়ো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ভুসকো রঙের লম্বা জোব্বা পরনে, পায়ে সাদা নাগরাই জুতো, মাথায় ভুসকো একটা ছোট্ট সাদা টুপি, আর ডান হাতের বকবার আঙুলে একটা মস্ত সবুজ পাথরের আংটি।

যেমন সিঁড়ির উপরের ধাপে এসে উঠেছি; আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'অ্যাঁ, তোকে তো আগে দেখিনি। তুই এখানে কেন এসেছিস? কী চাস তাই বল দেখি বাবা?' খিদেয় পেটটা খালি খালি লাগছিল, বললাম, 'কেন আসব না, এটা আমার বাবার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদার বাড়ি।' ভীষণ চমকিয়ে গিয়ে লোকটি কাছে এসে আমার কাঁধে একটা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাবার নাম কী ? তোমার ঠাকুরদাদার নাম কী?' নাম শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

কোথাও জনমানুষ নেই, চারদিকে অন্ধকার, রেলিঙের কাছে গিয়ে বুড়ো হাঁক দিলেন, 'পরদেশি! আমিন! বলি, কাজের সময় গেলি কোথায়, আলো দিবি না?' নীচের তলার অন্ধকার থেকে অস্পষ্ট একটা সাড়া এল, তারপর লম্বা একটা কাচের ঢাকনি-পরানো সেজ হাতে কুচকুচে কালো, ডিগডিগে লম্বা, গোলাপি গেঞ্জি, মিহি ধুতি আর গলায় সোনার মাদুলি পরা একটা লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল।

'ছিলি কোথায় হতভাগা? বাড়িতে লোক এলে দেখতে পাস না?' 'এজ্ঞে, বারোয়ারিতলায় হাফ-আখড়াইটা একবার দেখে এলাম।'

আমার দিকে ফিরে বলল, 'যাবে-না, খোকাবাবু, হাফ-আখড়াইতে? কেমন সব সং বেনিয়েছে, গান-বাজনা হতেছে।' বুড়ো বললে, 'চোপ্, ওসব ছেলেমানুষের জায়গা নয়। এসো, দাদা, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

সামনের ঘরে গেলাম। মেঝেতে লাল গালচে পাতা, মস্ত নীচু তক্তপোশে হলদে মখমলের চাদর বিছানো। তার কোনায় গোঁফঝোলা চুড়িদার পাঞ্জাবি গায়, কানে মাকড়ি একজন লোক দাঁড়িয়ে। তাকে বললেন, 'যাও এখন, বলেছি তো দশ টাকা চাঁদা আর পাঁচ ভরি আতর দেব তোমাদের বারোয়ারি পুজোর জন্য, এখন কেটে পড়ো।'

লোকটি চলে গেলে, আমাকে তক্তপোশে বসিয়ে পুঁটলির দিকে চেয়ে বললেন, 'ওতে কী? পালিয়ে এসেছ নাকি? কেন?' বলতে হল সব কথা। খানিকটা ভেবে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'পনেরো পেইছিস্? হতভাগা, তোর লজ্জা করে না? আঁক হয় না কেন? শুভংকরি পড়িস না? মুখ অমন পাংশুপানা কেন? খেইছিস্? অ্যাঁ, খাসনি এখনও? পরদেশি, যা দিকিনি, পচ্চুকে বলগে যা।' পরদেশি চলে গেলে বললেন, 'ইশ্, আমার কক্ষনো একটা আঁক কষতে ভুল হত না, আর তুই ব্যাটা একেবারে পনেরো পেলি! জানিস নবাবের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পেইছিলাম, হৌসের সব হিসেবের ভুল শুধরে দিয়েছিলাম বলে। দাঁড়া, কুট্টিকে ডেকে পাঠাই, সে তোকে আঁক শিখিয়ে দেবে।'

পরদেশি একটা রুপোর থালায় করে লুচি, সন্দেশ, ছানামাখা, আর এক গেলাস বাদামের শরবত এনে দিল।

তারপর বারান্দার কোণে শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো স্নানের ঘরে আরাম করে হাত পা ধুয়ে, পাশের ঘরে কারিকুরি-করা খাটে সাদা বিছানায় শুয়ে সারারাত ঘুমোলাম।

সকালে পরদেশি এসে ডেকে দিল, 'কুট্টিবাবু আঁক শেখাতে এসেছেন।' কুট্টিবাবুও এসে, চিত্র-করা পাটিতে বসে সারাটা সকাল আমাকে অঙ্ক কষালেন। পরদেশি কোনো কথা না বলে দু-জনকে দুই গেলাস দুধ দিয়ে গেল। বই নেই, কিছু নেই, পুঁটলিতে খাতা-পেনসিল ছিল, তাই দেখে কুট্টিবাবু মহাখুশি। কী বলব, যে সব অঙ্ক সারা বছর ধরে বুঝতে পারছিলাম না, সব যেন জলের মতো সোজা হয়ে গেল। কুট্টিবাবুর বই দরকার হয় না, সব মাথার মধ্যে ঠাসা।

উনি চলে গেলে, বারান্দায় বেরিয়ে দিনের আলোতে ভালো করে চেয়ে দেখি এরা সব বাড়িঘর ঝকঝকে পরিষ্কার করে ফেলেছে। উঠোনের ধারে ধারে বড়ো বড়ো টবে করে কতরকম পাতাবাহারের গাছ, আর উঠোনে দাঁড়ের উপর লাল-নীল-হলদে-সবুজ মস্ত মস্ত তোতা পাখি রোদে বসে ছোলা খাচ্ছে।

দেয়াল ঠেস দিয়ে পরদেশি মুচকি মুচকি হাসছে। 'কাকে খুঁজছ, খোকাবাবু?' বুড়ো লোকটির খোঁজ করলাম। 'কী তাঁর নাম পরদেশি? বড্ড ভালো লোক।' পিছন থেকে তিনি নিজে বললেন, 'আমার নাম শিবেন্দ্রনারায়ণ, লোকে শিবুবাবু বলে ডাকে। তুমি নাকি ভালো করে অঙ্ক কষেছ, কুট্টি বলছিল। এই নাও তার পুরস্কার। আমার হাতে একটা মস্ত সোনার মোহর গুঁজে দিলেন।' 'ও কী পরদেশি?' বাইরের দরজায় কারা যেন মহা ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি করছে। 'সঙেরা নয় পরদেশি?' পরদেশি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, আমি বললাম, 'এই রে, তবে নিশ্চয় বাবা এসেছেন আমাকে খুঁজতে।' ছুটে নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। মা, বাবা, বড়োকাকা আর পিসেমশাই এসেছেন। 'ইশ্, কী সাংঘাতিক ছেলে বাপু তুমি। এই খালি বাড়িতে অন্ধকারে, কালিঝুলের মধ্যে, খাওয়া নেই দাওয়া নেই দিব্যি রাত কাটিয়ে দিলে? বলিহারি তোমাকে।' অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি এক মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার তকতকে উঠোন, তোতা পাখির সারি, পাতাবাহারের গাছ, সব উড়ে গেছে। পাগলের মতো দৌড়ে উপরে উঠলাম, খালি ঘর খাঁ খাঁ করছে, ভাঙা স্নানের ঘরে শ্বেত পাথরের সব টালি খুলে পড়ে আছে। 'পরদেশি, ও পরদেশি, শিবুবাবু, কোথায় তোমরা?'

বাবা আমাকে খপ করে ধরে ফেললেন, 'জানিস না, শিবুবাবু আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা, পরদেশি তাঁর খাস খানসামা।'

আস্তে আস্তে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে মোহরটাকে পকেটে পুরে বললাম, 'চলো, টেস্টে আমি অঙ্কে ভালো নম্বর পাব, দেখো।' কাউকে কিছু বলতে পারলাম না।

আমি ঠিক করেছি বড়ো হয়ে টাকাপয়সা রোজগার করে আহিরিটোলার বাড়িটা সারিয়ে-সুরিয়ে সেখানেই থাকব। গঙ্গাটাও বেশ সামনে আছে।

ভূতুড়ে গল্প

বাড়িটাতে পা দিয়েই আমার মেজো পিসেমশাই টের পেলেন কাজটা ভালো করেননি। বাড়িটার বাইরে থেকেই কেমন গা ছমছম করে। কবেকার পুরোনো বাড়ি, দরজা-জানলা ঝুলে পড়েছে, শ্যাওলা জন্মে গেছে, ফোকরে ফাটলে বড়ো বড়ো অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে, ফটক থেকে সামনের সিঁড়ি পর্যন্ত রাস্তাটা আগাছায় ভরতি আর তার দু-পাশের শিরীষ গাছগুলো ঝোপড়া হয়ে মাথার উপর আকাশটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। সন্ধ্যেও হয়ে এসেছে, চারিদিকে সাড়াশব্দ নেই, কেমন একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে।

মেজো পিসেমশাই হাতের লণ্ঠনটা জ্বেলে ফেললেন। বার বার দোতলার ভাঙা জানলার উপর চোখ পড়তে লাগল, বার বার মনে হতে লাগল এক্ষুনি জানলার সামনে থেকে কে বুঝি সরে গেল। মেজো পিসেমশাইয়ের তো অবস্থা কাহিল। অথচ উনি ভূত বিশ্বাস করেন না, গোরস্থানকে ভয় করেন না, ডেড বডি কেয়ার করেন না। সেইজন্য তাল ঠুকে ঢুকে পড়লেন বাড়ির ভিতরে।

গঙ্গার উপরে বাড়ি। ঢুকেই একটা বড়ো খালি হল ঘর, আবছায়াতে হাঁ করে রয়েছে, লণ্ঠনের আলোতে দেয়ালে পিসেমশাইয়ের প্রকাণ্ড ছায়াটা নড়ে বেড়াচ্ছে। পিসেমশাই তাড়াতাড়ি হল পেরিয়ে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালেন। প্রকাণ্ড একটা বারান্ডা, তার রেলিং ভাঙা, তারপর একফালি শান-বাঁধানো চাতাল, তার চারদিকে সাদা সাদা সব পাথরের মূর্তি সাজানো। তারপরেই ঘাটের ভাঙা সিঁড়ি জল অবধি নেমে গেছে, তার অসংখ্য ইট জলে ধুয়ে গেছে। সিঁড়ির পাশেই একটা বুড়ো বাতাবি লেবুর গাছ, তার নীচে কবেকার পুরোনো ইটের গাদা, রোদে পুড়ে জলে ভিজে কালো হয়ে গেছে। গঙ্গার ওপারে জুট মিলের সাহেবদের বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখে পিসেমশাই ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন।

একতলায় বসে থাকলে চলবে না। উপরে যেতে হবে, রাত কাটাতে হবে। নইলে বাজি হেরে যাবেন; ক্লাবে মুখ দেখাতে তো পারবেনই না, উপরন্তু জগুর বাবা সোনালি ছাগলটাকে নিয়ে যাবেন।

হলের দু-পাশে সারি সারি ঘর, তাদের দরজাগুলো আধখোলা। দু-একটা বিশাল বিশাল কারিকুরি-করা ভাঙা তক্তপোশ, দু-চারটে প্রকাণ্ড খালি সিন্দুক, এক-আধটা বৃহৎ রংচটা আয়না ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মেজো পিসেমশাই তাড়াতাড়ি একবার সবটা দেখে নিয়ে এক দৌড়ে উপরে উঠে গেলেন।

দোতলাটাও ঠিক একতলার মতো। সেখানেও মাঝখানে প্রকাণ্ড একখানি হল। তার মধ্যে আসবাব কিছু নেই, খালি মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড বড়ো ঘোর নীল রঙের গালচে পাতা, তাতে বহুদিনের ধুলো জমে পুরু হয়ে রয়েছে। আর ঘরের কোণে দেয়ালে একটা সেতার ঝুলছে, তাতে তারের কোনো চিহ্ন নেই।

মেজো পিসেমশাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। দেয়ালের দিকে পিঠ করে, যাতে পিছন দিক থেকে হঠাৎ কিছুতে এসে না পড়ে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলেও চলবে না। প্রত্যেকটা ঘরের বর্ণনা দিতে হবে, তাই প্রত্যেকটা ঘর একবার দেখা দরকার। ভয় আবার কীসের? ভূত তো আর হয় না। ঘরগুলির প্রায় সব ক-টাই দরজা খোলা। একেবারে খালি, ধুলোয় ধূসর। দু-একটাতে ভাঙা ভাঙা আলমারি, প্রকাণ্ড জলচৌকি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখেন আলো ঝোলাবার বড়ো বড়ো হুক আছে, তার আশেপাশের ছাদটাতে ঝুলকালির দাগ রয়েছে। মেজো পিসেমশাই দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তা ছাড়া রাতই যখন কাটাতে হবে একটা বসবার জায়গা তো চাই।

হলের ওপাশে, গঙ্গার উপরে চওড়া বারান্ডা। গঙ্গায় একটা স্টিমার যাচ্ছে, তাতে মানুষ আছে, আলো জ্বলছে। ওপরে শত শত আলো জ্বলছে। মেজো পিসেমশাই রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়ালেন, ভর দিতে ভয় করে। যদি ভেঙে পড়ে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, ওই তো জাহাজে কত লোক দেখা যাচ্ছে, আঃ।

'এনেছিস্? কই দেখি।'

চমকে মেজো পিসেমশাই ফিরে দেখেন গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন সাদা জাব্বাজোব্বা-পরা একজন বুড়োমতো লোক। কী ভালো দেখতে, হাতির দাঁতের মতো গায়ের রং, দাড়ি নেই, লম্বা গোঁফটা পাকিয়ে পাকিয়ে কানের উপর তুলে রেখেছেন, টানা টানা চোখ। আশ্চর্য ফর্সা একখানি হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দে, দে, দেরি করিস নে। কখন এসে পড়বে।'

মেজো পিসেমশাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন লোকটার গলায় মুক্তোর মালা জড়ানো, কানে মুক্তো পরা, হাতের ভুল আঙুলে হিরের আংটি। অ্যাঁ! এ আবার কে!

লোকটি এবার বিরক্ত হয়ে বললেন— 'তুই কি বোবা হলি নাকি রে? আজকাল সব যা তা চাকর রাখতে আরম্ভ করেছে দেখছি। আছে, না নেই?'

মেজো পিসেমশাইয়ের গলাটলা শুকিয়ে একাকার, নীরবে মাথা নাড়লেন।

লোকটি হতাশভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'একটা বসবার জায়গাও কি এগিয়ে দিতে পারিস না? মাইনে খেতে লজ্জা করে না তোর? আমি আর কে, তা বটে, তা বটে, আমি এখন আর কে, যে আমার কথা শুনবি?'

হঠাৎ কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'অত যে নিলি তখন মনে ছিল না হতভাগা? এরজন্য তোকে কষ্ট পেতে হবে বলে রাখলাম, কী ভীষণ কষ্ট পেতে হবে জানিস না। তিলে তিলে তোকে— ওই রে, এল বুঝি।'

বিদ্যুতের মতো বুড়ো লোকটি হলের পাশের ঘরটাতে ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

মেজো পিসেমশাইয়েরও যেন কানে এল স্পষ্ট পায়ের শব্দ। দেয়ালের মতো সাদা মুখ করে, লণ্ঠনটাকে উঁচু করে ধরে, চারিদিক ভালো করে দেখে নিলেন, কেউ কোথাও নেই। লোকটা নিশ্চয় পাগল-টাগল হবে। অত গয়নাগাটিই-বা পেল কোত্থেকে? কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

লণ্ঠন হাতে বারান্ডা থেকে হলে ঢুকলেন। নীচের তলাটা বরং ভালো, একটা তক্তপোশে বসে বসেই রাত কাটানো যাবে। পকেট চাপড়ে দেখলেন 'অশরীরী-খুনে' লোমহর্ষণ ১০নং খানা দিয়ে দিতে জগুর বাবা ভোলেননি। রাত জেগে ওইটি পড়ে শেষ করে, কাল সকালে আগাগোড়া গল্পখানি বলতে হবে। তবে বাজি জেতা।

পা টিপে টিপে হল পার হয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সদর দরজার ডান পাশের ঘরখানিতে ঢুকে, ভাঙা সিন্দুকের উপর লণ্ঠন নামিয়ে, তক্তপোশের কোণটা ধুতির খোঁট দিয়ে ঝেড়ে, ধপ করে পিসেমশাই বসে পড়লেন। ময়লা খোঁটটা দিয়েই গলার, কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন। আঃ, বাঁচা গেল। ভাগ্যিস ভূতে বিশ্বাস করেন না। নইলে তো আজ ভয়েই আধমরা হয়ে যেতে হত।

সামনের রংচটা আয়নাতে একখানি সাদা ছায়া পড়ল। বুড়ো লোকটি ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে, অনুনয়ের স্বরে বললেন— 'দিয়েই দে-না বাবা। তোর আর কী কাজে লাগবে বল? যারা দেয় তারা প্রাণ হাতে করে এনে দেয়। না পেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়। কেন দিচ্ছিস না, বাপ? একে একে সবই তো প্রায় নিয়েছিস, আরও চাস বুঝি? তোর প্রাণে কি মায়াদয়াও নেই? প্রথম যখন এলি, কী ভালো মানুষটিই ছিলি? আমি উপরের ওই নীল গালচেটাতে বসে সেতার বাজাতাম, আর তুই বারান্ডায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে শুনতিস। তোকে কত-না ভালোবাসতাম, এটা-ওটা রোজই দিতাম, কত-না ভালোমানুষ সেজে নিতি। ভেতরে ভেতরে তুই যে এত বড়ো একটা বিশ্বাসঘাতক কেউটে সাপ তা কি আর জানি।'

মেজো পিসেমশাই লাফিয়ে উঠে এক হাত সরে দাঁড়ালেন। বুড়ো লোকটিও খানিকটা এগিয়ে এলেন, রাগে তার দু-চোখ লাল হয়ে গেল, ফর্সা দুটো মুঠো পাকিয়ে মেজো পিসেমশাইয়ের নাকের কাছে ঘুসি তুলে বললেন, 'একদিন এই ঘুসিকে দেশসুদ্ধ লোকে ভয় করত, কোম্পানির সাহেবরা এসে এর ভয়ে পা চাটত। এখন বুড়ো হয়ে গেছি, দুর্বল হয়ে গেছি, তাই আমার বাড়িতে আমার মাইনে-খাওয়া চাকর হয়ে, তোর এত বড়ো আস্পর্ধা। তবে এখনও মরিনি, এখনও তোকে এক মুঠো ভস্মে— না রে না, কী বাজে কথা বলছি। দিয়ে দে বাবা, দেখ তোকে তার বদলে কী দেব।'

এই বলে বুড়ো লোকটি আঙুল থেকে হিরের আংটিখানি খুলে মেজো পিসেমশাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মরিয়া হয়ে পিসেমশাই ইদিক-উদিক তাকালেন। কী যে দেবেন ভেবে না পেয়ে, পকেটে হাত দিতেই গোলাপি বিড়ির প্যাকেট দুটোর উপরে হাত পড়ল। তাই বের করে বুড়োর হাতে দিয়ে দিলেন।

'সত্যি দিলি? আঃ, বাঁচালি বাবা। এই নে, আমি আশীর্বাদ করছি তোর এক-শো বছর পরমায়ু হবে।'

এই বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে, মেজো পিসেমশাইয়ের বুকপকেটে আংটি ফেলে দিয়ে হলের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ির দিকে দে ছুট। পিসেমশাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। সিঁড়ির প্রথম ধাপটা অবধি তাকে লণ্ঠনের ক্ষীণালোকে দেখতে পেলেন, তারপর সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। আর পিসেমশাইও তক্ষুনি 'আরে বাপ' বলে মূর্ছা গেলেন।

পরদিন সকালে জগুর বাবা, পটলের মামা, আমার বাবা, আরও পাঁচ-সাত জনা গিয়ে ঠ্যাং ধরে টেনে পিসেমশাইয়ের ঘুম ভাঙালেন। উঠে দেখেন ঘরদোর রোদে ভরে গেছে। তাঁরা বললেন— 'উপরে গেছলি? তবে দে, উপরের বর্ণনা দে।'

ঠিক বলছেন কি না পরখ করবার জন্য সবাই মিলে উপরে গেলেন। পিসেমশাইও গেলেন।

সব ঘরদোর শূন্য হাঁ হাঁ করছে। জগুর বাবা তো রেগে টং। ইস, অত ভালো ছাগলছানা হাতছাড়া হয়ে গেল। ইস, ক্লাবের রাক্ষসগুলোকে তার উপরে বাজির খাওয়া খাওয়াতে হবে।

মাটিতে 'অশরীরী-খুনে' পড়ে ছিল।

'অ্যাঁ! ঠিক হয়েছে। বড়ো যে ঘুমুচ্ছিলি, বইটা পড়েছিলি? বল তবে, আগাগোড়া গল্পটা বল।' মেজো পিসেমশাইয়ের মুখে আর কথাটি নেই। মনে মনে দেখতে পেলেন জগুর বাবা সোনালি ছাগলটাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। সারারাত ঘুম লাগিয়েছেন, স্বপ্ন দেখেছেন, তার উপযুক্ত সাজা তো হবেই।

লজ্জায়, দুঃখে, মাথা নীচু করতেই চোখ পড়ল বুকপকেটের ভিতর হিরের আংটি জ্বলজ্বল করছে। মেজো পিসেমশাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে বললেন— 'নিয়ে যা তোর ছাগল। ইস, ভারি তো ছাগল।' বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সোজা বাড়িমুখো রওনা দিলেন।

সত্যি নয়

গল্পটা গুপির কাছে শোনা:

দলের মধ্যে মেলা লোক ছিল— মেজোমামা, ভজাদা, জগদীশবাবু, গুপির সেজদা, গুপি আর শিকারিরা দু-জন। সারাদিন বনেজঙ্গলে পাখিটাখি আর মেলা খরগোশ তাড়িয়ে বেড়িয়ে সন্ধ্যের আগে সকলে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। জমিদারবাবুর ঘোড়াগাড়ি এসে বাজপড়া বট গাছের তলায় অপেক্ষা করে থাকবে, ওঁরা জন্তুজানোয়ার মেরে ক্লান্ত হয়ে গাড়ি চেপে জমিদারবাড়ি যাবেন। সেখানে স্নানটান করে রাতে খুব ভোজ হবে। কিন্তু কী মুশকিল, আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরও যখন গাড়ি এল না, শিকারিরা দু-জন খোঁজ করবার জন্য এগিয়ে গেল। এরা সব গাছতলায় পা মেলে যে-যার পড়ে রইল।

আরও মিনিট কুড়ি গেল, দিব্যি চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, তখন জগদীশবাবু লাফিয়ে উঠে পড়লেন। 'ওঠ্ তোরা, এ জঙ্গলে নিশ্চয়ই বাঘ আছে।' খিদেয় সকলের পেট জ্বলে যাচ্ছে, তার উপর দারুণ পায়ে ব্যথা, কিন্তু ওকথা শুনেই সবাই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বেশ তারার আলো হয়েছে। তার মধ্যে মনে হল যেন ডান দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলে জঙ্গলটা পাতলা হয়ে এসেছে, সেখানে যেন আলো বেশি। সেদিকে খানিকটা যেতেই সবাই অবাক হয়ে দেখল সামনেই বিশাল একটা পোড়ো বাড়ি।

মেজোমামা তো মহা খুশি। বাঃ, খাসা হল, এবার শুকনো কাঠকুটো জ্বেলে দুপুরের খাবার জন্য যে বড়ো হাঁড়িটা আনা হয়েছিল তাতে করে খরগোশের মাংস রাঁধা যাবে। নিদেন একটু বিশ্রাম তো করা যাবে। সবাই খুশি হয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

গেটটা কবে থেকে ভেঙে ঝুলে রয়েছে, একটু একটু বাতাস দিচ্ছে, তাতে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করছে। বিশ্রী লাগে। পথে সব আগাছা জন্মে গেছে, বাগানটা তো একেবারে সুন্দরবন। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড বারান্দা। বারান্দার উপর উঠে জগদীশবাবু শ্বেত পাথরের মেজের উপর বেশ করে পা ঘষে কাদামাটি পরিষ্কার করে ফেললেন। গুপির সেজদা একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে বললে, 'জায়গাটাকে সেরকম ভালো মনে হচ্ছে না।' 'সেজদার যেমন কথা, ঘোর জঙ্গলের পোড়ো বাড়ি আবার এর থেকে কত ভালো হতে পারে।' গুপি আবার বললে, 'এ বাড়িটার বিষয় আমাদের চাকর হরি একটা অদ্ভুত গল্প বলছিল। এদিকে কেউ আসে না।'

একেবারে ভাঙা বাড়ি কিন্তু নয়। দরজাগুলো সব বন্ধ রয়েছে, কেউ বাস করাও একেবারে অসম্ভব নয়। তখন সকলে মিলে মহা হাঁকডাক লাগিয়ে দিলেন। কোনো সাড়াশব্দ নেই। সকলের

যে ঠিক ভয় করছিল তা নয়, কিন্তু কীরকম যেন অস্বস্তি লাগছিল, তাই সব এক জায়গায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেজোমামা বললেন, 'যা, যা, যেসব বীরপুরুষ, নে চল, দরজা ঠেলে খোল, রাঁধাবাড়ার আয়োজন করা যাক।'

ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল, খালি খালি সব বিশাল বিশাল ঘর, ধুলোতে ঝুলেতে ভরা। সেকালের পুরোনো চকমেলানো বাড়ি, মাঝখানে বিরাট এক উঠোন তার মধ্যে আবার একটা লেবু গাছ একটা পেয়ারা গাছ। সবটাই অবিশ্যি আবছায়া আবছায়া। উঠোনের পাশেই রান্নাঘর, সেখানে উনুন তো পাওয়া গেলই, এক বোঁচকা শুকনো খরখরে কাঠও পাওয়া গেল। মেজোমামা দেখতে দেখতে জায়গাটা খানিকটা ঝাড়পোঁছ করে নিয়ে রাঁধাবাড়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তখনও একটু একটু আলো ছিল, কিন্তু ঘরের ভিতর বেশ অন্ধকার। তবে ওঁদের সকলের সঙ্গেই পকেটলণ্ঠন ছিল। এখন একটু জল চাই।

আর সকলে কেউ-বা উঠোনের ধারে জুতো খুলে পা মেলে দেয়াল ঠেসান দিয়ে বসে পড়েছে, আবার কাউকে যেমন গুপিকে, গুপির সেজদাকে খরগোশ কাটবার জন্য লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারাও বলছে, জল না হলে পারবে না।

অগত্যা মেজোমামা টিফিন ক্যারিয়ারের বড়ো ডিবেটা আর একগাছি সরু দড়ি নিয়ে জলের চেষ্টায় গেলেন।

রান্নাঘরের ওপাশে সবজিবাগান ছিল, তার কোনায় একটা কুয়ো দেখা গেল। মেজোমামা খানিকটা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। আঃ, বাঁচা গেল, এখানে তাহলে লোকজন আছে। যা একটা থমথমে ভাব, আর গুপিটা যা বাজে বকে যে আর একটু হলে ভয়ই ধরে যেত! এই তো এখানে মানুষ রয়েছে। একটা ছোকরা চাকর ধরনের লোক কুয়োর আশেপাশে কী যেন আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মেজোমামার হাতে আলো দেখে সে ভারি খুশি হয়ে উঠল, 'যাক আলোটি এনে বড়োই উবগার করলেন বাবু, আমাদের বাবুর মাদুলিটা কোথাও পাচ্ছি না। বাবু আর আমাকে আস্ত রাখবেন না।'

মেজোমামার মনটা খুব ভালো— তিনিও মাদুলি খুঁজতে লেগে গেলেন, 'হ্যাঁরে কীরকম মাদুলি রে? এখানে আবার তোর বাবুও বাস করেন নাকি? আমরা তো মনে করেছিলাম বুঝি পোড়ো বাড়ি।' চাকরটা বললে, 'আরে ছো, ছো! পয়সার অভাবেই পোড়ো বাড়ি। ওই মাদুলিটা আমার বাবুকে একজন সন্ন্যাসী দিয়েছিল। ঔষধ হাতে বাঁধা থাকলে যে ঘোড়াতেই বাজি ধরেন সেটাই জিতে যেত। এমনি করে দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠলেন, টাকার গাদার উপর বসে থাকলেন।— দেখি, পা'টা সরান এখানটায় একটু খুঁজি।' 'হ্যাঁ তারপর একদিন আমাকে বললেন— বড্ড জং ধরে গেছে রে, ওটাকে মেজে আন। মাজলামও। তারপর যে বিড়ি ধরাবার সময় কোথায় রাখলাম আর খুঁজে পাচ্ছি না। সেই নাগাড়ে খুঁজেই বেড়াচ্ছি, এদিকে বাবুর সর্বনাশ হয়ে গেল। যে ঘোড়াতেই বাজি ধরেন সেই হয় মুচ্ছো যায়, নয় বসে পড়ে, নয় খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে আসে। এমনি করে বাড়ি গেছে, বাগান গেছে, টাকাপয়সা গয়নাগাটি, হাতিঘোড়া সব গেছে। এখন দু-জনে দিনরাত সেই মাদুলিই খুঁজে বেড়াই।' উপর থেকে ভাঙা হেঁড়ে গলায় শোনা গেল,

'পেলি রে?' 'না সার।' 'বলি খুঁজছিস তো নাকি খালি গল্পই কচ্ছিস?' বলতে বলতে একজন ফর্সা মোটা আধবুড়ো লোক দোতলার বারান্দার ধারে এসে দাঁড়ালেন, 'দেখ দেখ, ভালো করে

দেখ, যাবে কোথায়?' ঠিক সেই সময় মেজোমামা একটু ঠেস দিয়ে পা-টা আরাম করবার জন্য হাত বাড়িয়ে যেই-না পাশের বারান্দার থামটাকে ধরেছেন অমনি তার ছোট্ট কার্নিস থেকে টুপ করে পুরোনো লাল সুতোয় বাঁধা একটা মাদুলি মাটিতে পড়ে গেল। সুতোটা আলগা হয়ে গেল, মাদুলিটা গড়িয়ে চাকরটার পায়ের কাছে থামল। চাকরটার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবার জোগাড়, 'দেন কত্তা দুটো পায়ের ধুলো দেন— বাঁচালেন আমাদের।' উপর থেকে তার বাবুও দুড়দাড় করে পুরোনো শ্বেতপাথর-বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন। 'পেইছিস্! আর আমাদের ঠেকায় কে? বড়ো উপকার করলেন ব্রাদার, আসুন একটু কোলাকুলি করি—, বলে দুই হাত বাড়িয়ে মেজোমামাকে জড়িয়ে ধরেন আর কী, এমন সময় 'ও মেজোমামা, ও নেপেনবাবু, কোথায় গেলেন, আর জল দরকার নেই, শিকারিরা ঘোড়াগাড়ি নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।' বলে দলে দলে সব এসে উপস্থিত। মেজোমামা চমকে দেখেন চাকরটা, তার বাবু আর মাদুলি কিছুই কোথাও নেই। খালি পায়ের কাছে লাল সুতোটা পড়ে রয়েছে।

আস্তে আস্তে সেটা কুড়িয়ে বললেন, 'চ, খিদেও পেয়েছে ভীষণ!'

পথে যেতে শিকারিরা বললে, 'সাহস তো আপনাদের কম নয়, ওটা ভূতের বাড়ি, তা জানতেন না? বহুকাল আগে এক জমিদার ছিলেন, রেস খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছিলেন, তাঁর বাড়ি। কেউ ওখানে যায় না।'

বহুরূপী

ছোটোবেলাকার কত কথাই যে মনে পড়ে, কত কাণ্ডই যে তখন হত। একবার গুপের মামাতো ভাই ভোঁদা বলেছিল যে বহুরূপীরা পর পর সাত দিন আসে, এক-এক দিন এক-এক নতুন সাজে। কখনো কখনো সবাই তাঁকে বহুরূপী বলে চিনে ফেলে, আবার কখনো কখনো সে এমনি চেহারা বানিয়ে আসে যে কেউ তাকে বহুরূপী বলে টেরই পায় না। তারপর একদিন নিজের সত্যিকার চেহারা নিয়ে এসে, যে যা কিছু টাকাপয়সা দেয় চেয়ে নিয়ে যায়।

সেবার মধুপুরেও ঠিক তাই হল। সকালে মামিমা তরকারি কুটছেন, একজন গয়লার মেয়ে এসে কী চমৎকার খোয়া ক্ষীর বিক্রি করে গেল। পরদিন বিকেলে একজন ঝোলা ঝোলা পোশাক-পরা ফিরিঙ্গি পাদ্রি এসে মামার কাছে পোস্টাপিসের রাস্তা জিজ্ঞাসা করে, আধ ঘণ্টা বসে ভাঙা ভাঙা বাংলায় ইংরাজিতে গির্জার ঘণ্টা মেরামতের গল্প করে গেল। তার পরদিন আবার দেখি যে দশ-মুন্ডুওয়ালা রাবণরাজা সেজে এসেছে। গুপেরা হইচই করে উঠল। মামিমার ছোটো মেয়ে বুচকি ভয় পেয়ে খুব খানিকটা কাঁদল। তার পরদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অন্ধকার বারান্দায় খট খট শব্দ শুনে ভোঁদা বাইরে গিয়ে দেখে কী সর্বনাশ, থামে ঠেস দিয়ে বিকট একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে, বাতাসে তার হাত দুটো একটু একটু দুলছে, আর হাড়গোড় থেকে খটাখট শব্দ হচ্ছে। ভোঁদা দারুণ ভয় পেয়েছিল, কিন্তু গুপে এসেই বলল, 'এই বহুরূপী! তুমি তো ভারি চালাক হয়েছ!' অমনি কঙ্কালটা এমন করে অন্ধকার ঝোপের পাশে গা ঢাকা দিল যে সত্যি মনে হল বুঝি মিলিয়ে গেল? ততক্ষণে মামাও বেরিয়ে এসেছেন, ধমক দিয়ে বললেন, 'এই বহুরূপী, সাজতে হয় মজার মজার সাজ করো। এইরকম ভয়াবহ চেহারা করে এলে ছেলেপিলেরা ভীতু হয়ে যাবে যে।' অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা খিলখিল হাসি শোনা গেল। তারপর সব চুপচাপ। বড়োদের অনেকেরই নাকি গায় কাঁটা দিচ্ছিল!

পরদিন বহুরূপী মাতাল সেজে এসে আধঘণ্টা সবাইকে খুব হাসাল, বললে হয়তো সবাই বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সারাক্ষণ সে ঠ্যাং দুটো উঁচু করে হাতে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। বলল নাকি মাথা ঘুরছে বলে কিছু ঠাওর করতে পারছে না। আর সে যে কীসব আবোলতাবোল বকছিল সবাই হেসে লুটোপুটি। যাবার আগে আবার এক গেলাস জল চেয়ে, সেটা পায়ের আঙুল দিয়ে ধরে, জলটা গলায় ঢেলে নিল। সবাই তো হাঁ!

তার পরদিন সারাদিনই সবাই আশা করে আছে কখন বহুরূপী আসবে, এমন সময় একজন সাপের ওঝা এসে জোরজার করে সাপ খেলা দেখাবেই দেখাবে। সবাই তাকে বহুরূপী মনে করে

খুব রসিকতা করছে। এমন সময় একজন পুলিশসাহেব এসে মহা শোরগোল লাগিয়ে দিল; ও নাকি সত্যি ওঝা নয়, ডাকসাইটে চোর, বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নেয় কোথা দিয়ে কীভাবে গিয়ে জিনিসপত্র সরানো যেতে পারে। ওঝাটাও তাকে দেখেই জিনিসপত্রই গুটিয়ে নিয়ে দে দৌড়। তাড়াতাড়িতে একটা সত্যিকারের সাপও ফেলে গেল। কিন্তু শেষপর্যন্ত বটু মালী বলল ওটা হেলে সাপ, কাউকে কিছু বলে না, তবে কেউ কেউ বলে যে ওদের শনি-মঙ্গলবারে বিষ হয়, কাজেই সাবধানের মার নেই। ততক্ষণে সাপটা যে কোথায় পালিয়েছে তাকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। কিন্তু ওই লোক দুটোর মধ্যে কেউ বহুরূপী কি না তা বোঝাই গেল না।

পরদিন বিকেলে একজন বাউল এসে অনেকক্ষণ গান গেয়ে নেচে কুঁদে একাকার। বহুরূপীটার কত যে বিদ্যে জানা ছিল।

সন্ধ্যে বেলা পাশের বাড়ি থেকে হরিপদবাবুরা বেড়াতে এসে খুব রাগ করতে লাগলেন যে এইসব বহুরূপী সেজে যারা বেড়ায় তারাই দাগি চোর হয়, বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়, আর মামা কি না তাদের আশকারা দেন। একদিন যখন চেঁচেপুছে সব নিয়ে যাবে তখন পস্তাতে হবে, ঠিক হবে। যতসব ফেরিওয়ালা, বাউল, বহুরূপী, নাচিয়ে-গাইয়ে বাড়িতে পুরে এখন মহাদেবের মতো বুঁদ হয়ে থাকুন-গে, সংসারের ভারি কল্যাণ হবে। এদিকে পাড়ায় তো হামেশাই এটা হারাচ্ছে, ওটা হারাচ্ছে। তাতে আর কার কীবা এসে যাচ্ছে। মামার নিশ্চয় মনে মনে খুব রাগ হচ্ছিল, কিন্তু কিছু বললেন না।

তবে হরিপদবাবু চলে গেলে ডাক দিয়ে মামিমাকে বললেন, 'দেখ, ওর সাত দিন হয়ে গেছে, কাল দুটো টাকা দিয়ে বিদায় করে দিয়ো। যদিও অনেক দিন থেকেই ওকে জানি, তবু পাড়া-প্রতিবেশীকে চটাতে নেই।' বোঁদা বলল 'বা ব্বা! বিদেয় করে দিয়ো মানে। কাল ও তো একটা সাজ দেখাবে, একদিন যে আসেনি।' মামা অবাক হয়ে বললেন, 'সে আবার কবে?' 'কেন, যেদিন সেই সাপের ওঝা আর পুলিশসাহেব এসেছিল। ওই ওঝাকে এখানে অনেকে চেনে, ও বহুরূপী নয় কখনো। আর পুলিশসাহেব ও-রকম সাজপোশাক করা একে তো বহুরূপীর কম্ম নয়, অনেক খরচা লাগে। তার উপর পটলাদের কে হন উনি, নতুন এসেছেন।'

সবাই ভাবল তা হবেও-বা। মামা আবার বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, কালকের সাজটা নাহয় দেখেই নিয়ো, কিন্তু ও যাবার সময় দুটো টাকা ওর হাতে দেবে আর বলবে যেন আর এদিকে না আসে।'

পরদিন সবাই তাগ করে আছে কখন বহুরূপী আসবে, এমন সময় একটা নেংটি-পরা লোক বগলে একটা নোংরা পুঁটলি নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মামিমার পা জড়িয়ে ধরে হাঁউ মাঁউ করে কাঁদতে লাগল: 'মা, মিছিমিছি পাড়ার লোকে আমার পাছু নিয়েছে, আমাকে রক্ষা করুন, দৌড়ে দৌড়ে আর তো পারি নে, এক পেয়ালা চা না পেলে দু-দণ্ড না জিরুলে আমার বুকটা ফেটে যাবে।'

এমন চমৎকার বলল যে মনে হল সত্যিই যেন অনেক কষ্টে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে এসেছে, চা না পেলে আর বিশ্রাম না করলে এক্ষুনি মরে যাবে।

সবাই মিলে তার পিঠ চাপড়ে চায়ের জন্য বাড়ির পিছনে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিল। মামিমা তার হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, 'খুব ভালো সেজেছ, আজকের সাজটা সবচেয়ে ভালো হয়েছে। আর দেখো বাছা, উনি এখন বাড়ি নেই, তোমায় বলতে বলেছেন যে আমরা খুব খুশি হয়েছি কিন্তু তুমি আর এ-বাড়িতে এস না, পাড়ার লোকে আমাদের মন্দ বলে। তুমি চা খেয়ে

গোয়ালঘরে বিশ্রাম করে, বাড়ি যেয়ো কেমন?' বহুরূপী এমনি চালাক যে তবু কিছু ভাঙল না, সুড়সুড় করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ঘণ্টা খানেক বাদে হন্তদন্ত হয়ে মামা এসে হাজির! 'ওগো, সর্বনাশ হয়েছে, একেবারে দিনে ডাকাতি। কাল এত বক্তৃতা করে গেলেন আর আজই হরিপদবাবুরা ওপরে ঘুমুচ্ছেন আর নীচে থেকে তাঁদের সর্বস্ব চোরে নিয়ে গেছে, টাকাকড়ি গয়নাগাটি, ফাউন্টেন পেন, হাতঘড়ি, মায় চশমাটি অবধিও। হরিপদবাবুরা তাকে দেখতে পেয়েছেন পর্যন্ত, হাতে-নাতে ধরাও পড়ত, সবাই মিলে তাড়া করেছিল, কিন্তু এই দিকেই কোথায় যে গিয়ে গা ঢাকা দিল, সবাই মিলে এতক্ষণ গোরুখোঁজা করলাম, তবু টিকিটিও আর দেখা গেল না। এদিকে আসেনি তো?'

মামিমা মাথা নাড়তে যাচ্ছেন এমন সময় রোগা তেল চুকচুকে একজন লোক এসে নমস্কার করে হাতজোড় করে দাঁড়াল, মামা বললেন, 'আরে বহুরূপী যে! চুরির কথা শুনেছ তো? এবার তোমাদের সন্দেহ করবে সব। হরিপদবাবু কালকেই সেকথা বলে বেড়াচ্ছিলেন। দাও তো ওর টাকা দুটো। তুমি বাপু এদিকে আর এসো-টেসো না।'

বহুরূপী একগাল হেসে বলল, 'এজ্ঞে না বাবু, আমি এক্ষুনি আটটার গাড়ি ধরে এক্কেবারে রামকিষ্টপুরের ওদিকে মামাবাড়ি চলে যাচ্ছি। ওই হরিপদবাবুটির যেমনি সন্দেহ বাতিক তেমনি অসাবধান।'

মামিমা কী আর করেন, দিলেন দুটো টাকা; মামা রেগে যাবেন, বলাও যায় না সব কথা। যাবার সময় বহুরূপী মামার মামিমার পায়ের ধুলো নিয়ে, গুপে আর ভোঁদার দিকে ফিরে এক বার চোখটা টিপল।

পরে আমরা শুনলাম নেংটি-পরা লোকটা, চা খেয়ে জিরিয়ে জুরিয়ে, ঠাকুরের কাছ থেকে পান খাবার জন্য চার আনা চেয়ে কখন গুটিগুটি কেটে পড়েছে। মামিমা বললেন চেপে যেতে। আজ পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না।

মেজোমামার প্রতিশোধ

আমার মেজোমামাকে নিশ্চয় তোমরা কেউ দেখনি। হাড় জিরজিরে রোগা বেঁটেমতন, সরু লিকলিকে হাত পা; সারা মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। কারণ মেজোমামা দু-সপ্তাহে একবার দাড়ি চাঁচেন, নাকি দাড়ি কামালেই মুখময় আঁচড়ে যায়; খাটো করে ধুতি পরা, আর প্রাণ ভরে নানা রকমের ভয়, চোরের ভয়, পুলিশের ভয়, বাঘের ভয়, গাড়ি চাপা পড়ার ভয়, রোগের ভয়, ডাক্তারের ভয়, ভূতের ভয়, আর সবচেয়ে বেশি ভয় নিজের শ্বশুরকে।

মেজোমামার শালার বিয়ে হবে। শ্বশুর লিখে পাঠালেন মেজোমামাকে নিজে গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে শ্বশুরের ঠাকুরমার আমলের লাখ টাকার গয়না বের করে নিয়ে নৈহাটি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। খুব সাবধানে যাওয়া-আসা করতে হবে কারণ ও-জিনিস একবার গেলে আর হবে না: আর দুষ্টলোকে খবর পেলে ওর জন্য মারপিট খুনজখম করতে পিছুপাও হবে না। শুনে তো মেজোমামার জিভতালু জড়িয়ে গেল, অথচ না গেলেও নয়, শ্বশুর তাহলে আর আস্ত রাখবেন না।

বঙ্কুদাদার গাড়িটা চেয়ে নিয়ে একেবারে স্টেশন যাবার পথে গয়নার বাক্স বের করে নিয়ে একটা আধময়লা বাজারের থলিতে পুরে, তার উপর কতকগুলো মুলোটুলো দিয়ে যত্ন করে ঢাকা চাপা দিয়ে তো স্টেশনে নামা গেল। টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চির একটি কোনা দখল করতেও বেশি সময় লাগল না। এতক্ষণে মেজোমামা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। থলিটাকে বেঞ্চির কোণে গুঁজে তার উপর একরকম চেপে বসে ওফ করে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধুতির খুঁটটা দিয়ে কপালের গলার ঘামটাম মুছে নিলেন। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে পাশে বসে পড়ল। উঃ, যেন সাক্ষাৎ বকরাক্ষস, ইয়া ছাতি, ইয়া ভুঁড়ি আর ইয়া বড়ো বড়ো পান-খাওয়া বত্রিশপাটি দাঁত। তাকে দেখেই মেজোমামার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, কী অসৎ চেহারা লোকটার সে আর কী বলব। কানের লতি টানা, নাকের ফুটো বড়ো, চোখ ছোটো, জোড়া ভুরু, আঙুলের গিঁটে গিঁটে লোম।

মেজোমামা জড়সড় হয়ে বসলেন, ট্রেনটা লাগলে বাঁচা যায়। এমন সময় লোকটা ঝুঁকে পড়ে কানে কানে বলল, 'দামোদরের দলের লোক না? মুখটা যেন চেনাচেনা লাগছে।' মেজোমামা কথা বলবেন কী, জিভ শুকিয়ে শুকতলা। লোকটা একটু কাষ্ঠ হেসে আবার বলল, 'ঘাবড়াচ্ছ কেন? জান না কুকুরে কুকুরের মাংস খায় না।' মেজোমামা অনেক কষ্টে ঢোঁক গিলে হঠাৎ সাহস করে উঠতে যাবেন, অমনি লোকটা কনুই ধরে টেনে আবার বসিয়ে

দিয়ে বলল, 'আহা শোনোই-না। কথা আছে।' মেজোমামা আবার বসে পড়লেন। পেটটা ব্যথা ব্যথা করতে লাগল। লোকটা বলল, 'মাথা না ঘুরিয়ে আড় চোখে চেয়ে দেখো আমাদের বাঁয়ে যে খাঁকি হাফপ্যান্ট-পরা লোকটা হলদে সুটকেশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওই হল ব্যাঙ্কের বড়ো জমাদার, নৈহাটি যাচ্ছে। নকুলেশ্বরবাবুর ছেলের বিয়ের গয়না আছে, এই অবধি বলে সুরুৎ করে লোকটা জিভের জল টেনে নিয়ে আরও বললে, 'হ্যাঁ, আর বলতে হবে না, অমন ভালোমানুষও সাজতে হবে না। তুমিও আলুমুলো ব্যাগে করে ডেলি প্যাসেঞ্জার সেজে কেন বসে আছ সে আমি বেশ জানি। দেখো, মুখের ভাবখানা বদলাবে কোত্থেকে, ওতে যে ছাপ মারা রয়েছে।' মেজোমামা একেবারে থ! লোকটা বলে কী?

ঠিক সেই সময়ে গাড়ি ইন করল, আর সক্কলে ধড়মড় করে উঠে পড়ল। তারই মধ্যে লোকটা মেজোমামার কানে কানে দাঁতে দাঁত ঘষে চাপা গলায় বললে, 'দেখো দামোদরের চেলা, আজ আর কোনো চালাকি করতে এস না, তাহলে পিটে তোমাকে আলুভাতে বানিয়ে দেব, এই দেখো।' বলে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক ঘুসি পাকিয়ে মামার নাকের কাছে নেড়ে দিল। 'খবরদার আমাদের পাছু নেবে না। আমি ওই লোকটার সঙ্গে এক গাড়িতে যাব, নৈহাটি স্টেশনের আগে একটা পোস্টের ধারে বীরেশ্বর, জানই তো বীরেশ্বরকে, দাঁড়িয়ে আছে। যেই তার কাছে ট্রেন পৌঁছোবে, হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে লোকটার ঘাড়ে পড়ে, বাঁ-হাতে জানলা দিয়ে ব্যাগ মাটিতে ফেলতে নটবর শর্মার বেশি সময় লাগবে না। তুমি বরং ওই গাড়িতে ওঠো।' বলে মেজোমামাকে একরকম কোলপাঁজা করে ধরে সামনের একটা থার্ড ক্লাসে তুলে দিয়ে নিজে সেই লোকটার সঙ্গে পাশের গাড়িতে চেপে বসল। মেজোমামা এতক্ষণ টুঁ শব্দটি করেননি। সারা গা দিয়ে দরদর করে তাঁর ঠান্ডা ঘাম ঝরছে। আর পা কাঁপুনি থামতে থামতে নৈহাটি এসে গেল। সেকেন্ড ক্লাসের টিকিটটা মাটিতে ফেলে দিয়ে সুড়সুড় করে নেমে পড়ে ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে গেটের উলটো দিকে ছুটলেন। গাড়িতে খুব-একটা শোরগোল হচ্ছে টের পেলেন।

লাইন পার হয়ে বাজারের থলি হাতে মেজোমামা পা চালিয়ে এগুতে লাগলেন। বেশ খানিকটা পথ, অন্ধকার হয়ে আসছে, এমনি সময় একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন একজন মোটা লোক হনহন করে পিছন পিছন আসছে। মেজোমামার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। সেই লোকটাই বটে। কোথাও জনমানুষ নেই, থলে নিয়ে মেজোমামা বাতাসের বেগে ছুটে চললেন। কিন্তু ল্যাগব্যাগে হাত-পা নিয়ে কত আর ছুটবেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে লোকটা অনেক এগিয়ে এল। ভয়ে তো মেজোমামার চক্ষু চড়কগাছ; এখন কী করা যায়? লোকটাকে পিটলে কেমন হয়? সেও এক মুশকিল। যা জল্লাদের মতো বপুখানি, আর উরে বাপরে, কী খুনে প্যাটার্নের চেহারা! ছোটোবেলা থেকে মেজোমামার ঠাকুরমা ওঁকে দিনরাত বলে এসেছেন, 'ন্যাপলা, ফের শুঁয়োপোকা মাড়াচ্ছিস, দাঁড়া, তোকে আর জন্মে শুঁয়োপোকা হতে হবে। অ্যাঁ, মাকড়সা ঠ্যাঙাচ্ছিস নাকি? জানিস তুই আর জন্মে মাকড়সা হবি? ও কী রে, হাতে ঢিল কেন রে? ঢিল ছুঁড়লে ঢিল খেয়ে মরতে হয় তা জানিস?' কাজে কাজেই কাউকে আর ঠ্যাঙানোই হত না। কিন্তু আজ তা বললে চলবে কেন? হ্যাঁ, স্টেশনের সেই লোকটাই তো বটে। নিশ্চয় সুটকেশ খুলে তার মধ্যে জামা ইজের দেখে রেগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ছুটে আসছে। ছোটোবেলা থেকে কত লোক যে মিছিমিছি পা মাড়িয়ে দিয়েছে, কান মলেছে, ভেংচি কেটেছে, চুল ছিঁড়েছে, কালি দিয়ে পিঠে গাধা লিখেছে, বিয়ের সময় শালিরা নুন জল আর ন্যাকড়া দিয়ে সন্দেশ খাইয়েছে, অফিসে অন্য বাবুরা এপ্রিল ফুল বানিয়েছে তার উপর আজ এই। হঠাৎ মেজোমামার মাথায়

খুন চেপে গেল। থলেটাকে রাস্তার ধারে নামিয়ে রেখে এক পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেন। যেই-না সেই লোকটা কাছে এসেছে ঝড়ের মতো ছুটে গিয়ে দিলেন তার নাকে প্যাচ করে এক ঘুসি, তারপর মুখের উপর ধাঁই করে আরেকটা। লোকটা এমনি অবাক হয়ে গেল যে, কিচ্ছু করতে পারল না। মেজোমামা তাকে বেদম পিটলেন। উঃ, সে কী পিটুনি, চড়-লাথি-ঘুসি-কানমলা-চুলছেঁড়া, বিকট বিকট ভেংচি কাটা, নেহাত অন্ধকার ছিল বলে সে দেখতে পেল না, নইলে বাছাধনের পিলে চমকে যেত। তারপর সে যখন হাঁপাতে হাঁপাতে মাটিতে বসে পড়ল মেজোমামা থলে তুলে নিয়ে হাওয়া।

শ্বশুরবাড়ি পৌঁছোলেন অনেক রাতে, ঘুরে ফিরে নার্ভাসনেসের চোটে ভুল রাস্তা দিয়ে চলে গিয়ে। বাড়ির লোকেরা তো ব্যস্তই হয়ে উঠেছিল। শ্বশুরমশাই ছুটে এসে গয়নার বাক্সটা হাতে নিয়ে বললেন, 'যাক বাবাজি, নিরাপদে যে এসেছ এই আমাদের ভাগ্যি। চারদিকে যা সব কাণ্ড হচ্ছে। এইমাত্র বটু খবর দিল বিকেলের ট্রেনে চুরি-ডাকাতি হয়েছে, আবার নলডাঙার মোড়ে হেডমাস্টার মশাইকে তিন-চারটে গুন্ডা বেদম ঠেঙিয়েছে। বেচারি ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ওকী, এ-রকম মুখে হাত দিয়ে খুকখুক করছ যে? কাশি হয়েছে বুঝি? ওরে মেধো, জামাইবাবুর স্নানের জন্য শিগগির গরম জল দে, খাবার-টাবার তো রেডিই আছে।'

মেজোমামা এতক্ষণে শ্বশুরমশাইকে টিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে বললেন, 'আমাকে কিন্তু কাল সকালের গাড়িতেই ফিরে যেতে হবে।'

কী বুদ্ধি

জন্তুজানোয়ারদের বিষয়ে কতরকম অদ্ভুত গল্পই যে শোনা যায় তার আর ঠিক নেই। একবার নাকি একটি ব্যাঙ কেমন করে পাথরের ফোকরের মধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়ে, ওইভাবে কতকাল যে ছিল তার ঠিক নেই। বোধ হয় অনেক-শো বছর। তারপর যেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হল, অমনি সে চাঙা হয়ে উঠে বার দুই চোখ মিটমিট করে, থপ থপ করে কোথায় চলে গেল, যেন কিছুই হয়নি।

তারপর আরেকটা অদ্ভুত গল্প শুনেছিলাম, গোবি মরুভূমিতে কয়েক জন ভূপর্যটক নাকি বিরাট বিরাট গোল গোল পাথরের মতো কী পেয়েছিলেন, সেগুলি ভেঙে দেখেন কোন অতিকায় জানোয়ারের ডিম। বালির মধ্যে থেকে ভিতরটা একটুও নষ্ট হয়নি।

এসব গল্পের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে অবশ্য আমি কিছুই বলতে চাই না, তবে চেনাজানা জানোয়ারের মধ্যে, একবার একজন বাঘ-শিকারির কাছে একটি মজার বাঁদরের গল্প শুনেছিলাম। তাঁর নাম মুকুন্দবাবু, তিনি তো বলেছিলেন গল্পটা সত্যি।

একবার নাকি তাঁরা লোকজন নিয়ে মধ্য ভারতের কালাহান্দির ঘোর জঙ্গলে বাঘ শিকারে গেছেন। গভীর বনের মধ্যে তাঁবু গেড়েছেন। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে অবধি কানে আসছে একটা অনর্গল গুনগুন শব্দ। আশেপাশে ভালো করে তাকিয়ে দেখেন, বিরাট এক বোলতার চাক, লম্বা হয়ে নীচু একটা গাছের ডাল থেকে ঝুলে রয়েছে। হাজার হাজার বোলতা যাওয়া-আসা করছে, আর গুনগুন শব্দ হচ্ছে।

তাঁবুর সামনে বসে মুকুন্দবাবু মজা দেখছেন। চাক থেকে নীচে মাটির উপর টুপটুপ করে মধু পড়ছে, প্রজাপতিরা উড়ছে, পাখিরা কিচিরমিচির করছে। এমনি সময় চোখ পিটিরপিটির করতে করতে এক বাঁদরছানা এসে হাজির। ছোঁক ছোঁক করতে করতে একেবারে চাকের তলায় গিয়ে উপস্থিত।

চাকটা খুব নীচু ডালে ঝুলছে, বাঁদরছানা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাই দেখল। তারপর আঙুল দিয়ে মাটি থেকে একটু মধু তুলে নিয়ে চেটে খেল।

ইস্! কী ভালো রে! আরেকটু পেলে হয়।

এই ভেবে বাঁদরছানা চাকটাকে একটু ঠেলে-ঠুলে দেখতে লাগল। হয়তো-বা একটা বোলতাকে চিপে দিয়ে থাকবে, কী যে কারণেই হোক, কোত্থেকে এক বোলতা এসে দিয়েছে হুল ফুটিয়ে। আরে বাপ! আর যায় কোথা! ওই ছোটো বাঁদরছানা মানুষের মতো হাত ঝেড়ে, লাফিয়ে

ঝাঁপিয়ে, সাংঘাতিক ক্যাঁও ম্যাও করে, জঙ্গলটাকে একেবারে মাতিয়ে তুলল। তারপর চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দৌড়োতে দৌড়োতে সে তো সেখান থেকে ভাগল।

কিন্তু একটু বাদেই, ও মা, কোত্থেকে এক ধাড়ি বাঁদরকে সঙ্গে এনে হাজির! চাকের কাছে এসে কিচিরমিচির হুকুহুকু করে কী যে না বলল তার ঠিক নেই।

তারপর ছানা বাঁদর তফাতে দাঁড়িয়ে রইল, ধাড়ি বাঁদর খুব সাবধানে গুঁড়ি মেরে চাকের কাছে এসে উপস্থিত হল। ততক্ষণে বেলা একটু বেড়েছে, বোলতারা বেশিরভাগই চাকের মধ্যে ঢুকেছে, মাঝে মাঝে একটা একটা বেরুচ্ছে, আর উড়ে চলে যাচ্ছে।

বুড়ো বাঁদর খানিকক্ষণ ধরে চাকটাকে খুব নজর করে দেখল। তারপর গম্ভীর মুখ করে বাঁ-হাতের তেলো দিয়ে বেরুবার গর্তটাকে চেপে ধরল। ছানা বাঁদর দূর থেকে হাঁটুর উপর হাতের ভর দিয়ে কাণ্ড দেখতে লাগল। যেই-না ভিতর থেকে একটা বোলতা বেরুতে চায়, বুড়োর হাতে সুড়সুড়ি লাগে বোধ হয়, আর অমনি সে হাতটা একটুখানি ফাঁক করে ডান হাত দিয়ে খপ করে বোলতাটাকে ধরে, দাঁত দিয়ে কামড়ে মুণ্ডু ছিঁড়ে নিয়ে, বোলতাটাকে মাটিতে ফেলে দেয়। হাতের তেলোর চামড়া এমনি পুরু যে তাই বোধ হয় বোলতারা আর হুল ফুটোতে পারে না!

তাঁবু থেকে মুকুন্দবাবু অবাক হয়ে দেখলেন যে দেখতে দেখতে বাঁদরের পায়ের কাছে, ছোটোখাটো একটা বোলতার ঢিপি জমে গেল। ছোটো বাঁদরটা তখনও মনোযোগ দিয়ে দেখছে। তারপর মুকুন্দবাবুরা কাপড়চোপড় পরে, দলবল নিয়ে শিকারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

ফিরলেন সেই সূর্য ডোবার সময়, ক্লান্ত শরীরে। তাঁবুতে ফিরে, স্নান সেরে, বাইরে এসে ডেক চেয়ারে পা মেলে দিয়ে বসলেন। চারিদিকে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। হঠাৎ মুকুন্দবাবু দারুণ চমকে উঠলেন। কী সর্বনাশ, ওই না ছানা বাঁদরটা এখনো সেইখানে দাঁড়িয়ে উত্তেজনার চোটে একবার এ পায়ে, একবার ও পায়ে লাফাচ্ছে!

বুড়ো বাঁদরও বোলতার চাকের তলায় বসে, আর তার পাশে দেড় হাত উঁচু একটি বোলতার পাহাড়! তখনও সে একমনে একটির পর একটি বোলতা কামড়ে চলেছে। যতক্ষণ মুকুন্দবাবু জেগে রইলেন বাঁদর দুটোও নড়ল না।

তারপর ওঁরা তো খেয়ে-দেয়ে শুতে গেলেন। পরদিন সকালে উঠে দেখেন, বাঁদর দুটো কখন চলে গেছে। বোলতার চাকের তলায় একটা বোলতার পাহাড়। আর সকাল বেলার রোদে প্রজাপতিরা উড়ছে, পাখিরা কিচিরমিচির করছে, কিন্তু বোলতাদের কোনো সাড়াশব্দ নেই।

যুগান্তর

ব্যাপারটা ঘটেছিল আমাদের হাফ্‌ইয়ারলির ফল বেরুবার ঠিক পরেই। পরীক্ষার আগে দু-তিন দিন ধরে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে এত পড়লাম, অথচ ফল বেরুলে দেখলাম, ইংরেজিতে ২২, বাংলায় ২৯, আর অঙ্কের কথা নাই বললাম। তাই দেখে শুধু বাড়ির লোকদের কেন, আমার নিজের সুদ্ধু চক্ষুস্থির। শেষপর্যন্ত বাড়িতে একরকম টেকা দায় হল।

আমার বন্ধু গুপিরও সেই একই অবস্থা। ওর বাবা আর এককাঠি বাড়া। ক্লাবে নাম কাটিয়ে-টাটিয়ে, মাউথ অর্গ্যান কেড়ে নিয়ে একাকার করলেন; সন্ধ্যে বেলায় গুপি এসে বলল, 'জানিস, মানোয়ারি জেটি থেকে একটা মালবোঝাই জাহাজ আন্দামান যাচ্ছে আজ!' আমার হাত থেকে পেনসিলটা পড়ে গেল, বুকের ভিতরটা ধক করে জ্বলে উঠল। বললাম, 'কে বলেছে?' গুপি বলল, 'মামাদের আপিস থেকে মাল বোঝাইয়ের পারমিট করিয়েছে। আজ রাত দু-টোয় জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে পড়বে।'

বললাম, 'ডায়মন্ডহারবারের কাছেই ওপার দেখা যায় না। আর একটু এগুলে না জানি কেমন!' গুপি বলল, 'যাবি? না কি বাকি জীবনটা রোজ বিকেলে অঙ্ক কষে কাটাবি?' পেনসিলটা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। বললাম, 'পয়সাকড়ি নেই, তারা নেবে কেন?' গুপি বলল, 'পয়সা কেন দেব? অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে একসময়ে চড়ে বসে থাকব, মেলা জেলেডিঙি রয়েছে, তার কোনো অসুবিধা হবে না। তারপর লাইফবোটের ক্যাম্বিশের ঢাকনির তলায় লুকিয়ে থাকতে হয়। তারপর জাহাজ একবার সমুদ্রে গিয়ে পড়লেই হল, ওরও ফেরবার নিয়ম নেই, আমাদেরও নামাবার উপায় থাকবে না! যাবি তো চল। আজ রাত বারোটায় এসপ্ল্যানেডে তোর জন্য অপেক্ষা করব।'

চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম আন্দামানের ঝিনুক দিয়ে বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ টিয়া পাখি উড়ে যাচ্ছে, আর মাথার উপর ঘোর নীল আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে, দূরে সুন্দরী গাছের বন থেকে সারি সারি কালো হাতি বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ি মাথা দিয়ে ঠেলে নিয়ে আসছে। বললাম, 'বেশ, তাই হবে।'

তারপর যে কত বুদ্ধি করে রাত বারোটায় সেখানে গিয়ে গুপির সঙ্গে জুটলাম সে আর কী বলব। সঙ্গে একটা শার্ট, প্যান্ট, তোয়ালে আর একটি টর্চ ছাড়া আর কিছু নেই। রাতে খাবার সময় ওই পুরোনো কথা নিয়ে আবার একচোট হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকবার আর আমার একটুও ইচ্ছা নেই। আর গুপির কথা তো ছেড়েই দিলাম। সে কোনোদিনই বাড়িতে থাকতে চায় না।

গঙ্গার দিকেই যাচ্ছিলাম। অনেকটা এগিয়েছি, লাটসাহেবের বাড়ির গেটটা পেরিয়ে আরও খানিকটা গিয়েছি, এমন সময় দেখি ক্যালকাটা গ্রাউন্ডের পাশে, ইডেন গার্ডেনের সামনে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড চার ঘোড়ার গাড়ি আসছে। আমরা তো অবাক। জন্মে কখনো চার ঘোড়ার গাড়ি দেখিনি। কলকাতা শহরে আবার চার ঘোড়ার গাড়ি যে আছে তাই জানতাম না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম চারটা কালো কুচকুচে দৈত্যের মতো বিরাট ঘোড়া। তাদের সাজগুলো তারার আলোয় জ্বল জ্বল করছে, ঘাড়গুলো ধনুকের মতো বাঁকা, মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়া দিচ্ছে, নাক দিয়ে ফড়র ফড়র আওয়াজ করছে, ঝন্‌ঝন্ করে চেন বকলস্ বেজে উঠছে, অত দূর থেকেও সে-শব্দ আমাদের কানে আসছে। ষোলোটা খুর থেকে মাঝে মাঝে স্পার্ক দিচ্ছে। সে না দেখলে ভাবা যায় না।

গাড়িটা ততক্ষণে ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে বাঁ-হাতে ঘুরে অ্যাসেম্বলি হাউসের দিকে বেঁকেছে। ওইখানে সারাদিন মিস্ত্রিরা কাজ করেছে, পথে দু-একটা ইটপাটকেল পড়ে থাকবে হয়তো। তাতেই হোঁচট খেয়ে সামনে দিককার একটা ঘোড়ার পা থেকে নালটা খুলে গিয়ে শাঁই শাঁই করে অন্ধকারের মধ্যে একটা ভাঙা চক্র এঁকে, কতকগুলি ঝোপঝাপের মধ্যে গিয়ে পড়ল। খানিকটা খুরের খটাখট চেনের ঝমঝম শব্দ করে, আরও হাত বারো গড়িয়ে এসে, বিশাল গাড়িটা থেমে গেল।

ততক্ষণে আমরা দু-জনে একেবারে কাছের গোড়ায় এসে পড়েছি। দেখি গাড়ির পিছন থেকে চারজন সবুজ পোশাক-পরা, কোমরে সোনালি বেল্ট-আঁটা সইস নেমে পড়ে, ছুটে গিয়ে চারটে ঘোড়ার মুখে লাগাম কষে ধরেছে। সামনে দিকের ডান হাতের ঘোড়াটার চোখের সাদা দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে মাথা তুলে সে একবার ভীষণ জোরে চিঁ-হি-হি-হি করে ডেকে উঠল। সেই শব্দ চারদিকে গমগম করতে লাগল। গাড়ির মধ্যে থেকে একজন লম্বা-চওড়া লোক নেমে পড়ল।

বোধ হয় ওরা কোনো থিয়েটার পার্টির লোক, কোনো বিদেশি জাহাজে অভিনয় করে ফিরছিল। কারণ লোকটার দেখলাম রাজার মতো পোশাক পরা, কিংখাবের মখমলের জোব্বা পাজামা, গলায় মুক্তোর মালা, কানে হিরে। আর সে কী ফর্সা সুন্দর দেখতে। মাথায় মনে হল সাত ফুট লম্বা। রাজা সাজবারই মতো চেহারা বটে! ততক্ষণে সবাই মিলে অন্ধকারের মধ্যেই নালটাকে খুঁজছে। আমাদের দিকে কারো লক্ষ নেই। আমি টপ-করে থলি থেকে টর্চটা বের করে টিপতেই দেখি ওই তো ঝোপের গোড়ায় নালটা পড়ে আছে। রুপোর মতো ঝকঝক করছে। গুপি ছুটে গিয়ে সেটি হাতে করে তুলে নিল, তখনও একেবারে গরম হয়ে আছে।

নাল হাতে ওদের কাছে গেলাম। এতক্ষণে আমাদের দিকে ওদের চোখ পড়ল। 'কোথায় পেলি, বাপ্?' 'ওইখানে ঝোপের গোড়ায়', গুপি ঝোপটা দেখিয়ে দিল। 'বাঃ বেড়ে আলোখানি তো বাপ। ওরাই দিয়েছে বোধ হয়। তাহলে আরেকটু দয়া করে, ওইদিকে কোথায় কামারের দোকান আছে বলে দে দিকিনি, ওটি না লাগালে তো আর যাওয়া যাবে না।'

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গুপির দিকে তাকালাম। কামার কোথায় পাব? গুপি বললে, 'চলুন, আগে একটা সাইকেল মেরামতের দোকান আছে, তাদের আমি চিনি, তারা করে দিতে পারবে মনে হচ্ছে।'

'তাহলে ওঠ্। বাপ, ওঠ। আর সময় নেই।'

দু-জনে গাড়ির মধ্যে ভদ্রলোকটির পাশে উঠে বসলাম। মখমলের সব গদি। থিয়েটারের লোকেরা আছে বেশ! আর ভুরভুর করছে আতরের তামাকের গন্ধ। ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলা দলিলপত্রও রয়েছে দেখলাম।

গুপি বাতলিয়ে দিল, বাঁয়ে ঘুরে ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে পথ, আস্তে আস্তে চললাম। ঘোড়ার পায়ে ব্যথা লাগে। ছোট্ট গলির মধ্যে দোকান। অত বড়ো চার ঘোড়ার গাড়ি তার মধ্যে ঢুকবে না। ঢুকলেও আর ঘুরবার উপায় থাকবে না। ভদ্রলোক কেবলই তাড়া দিতে লাগলেন, দেরি করলে নাকি নন্দকুমার নামের একটা মানুষের প্রাণ যাবে। তখন গুপি নাল হাতে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে বলল, 'এইখানেই দাঁড়ান, আমি গিয়ে যন্ত্রপাতিসুদ্ধু শম্ভুকে ডেকে আনি। তুই আয় আমার সঙ্গে।' অগত্যা দু-জনেই নামলাম। শম্ভুকে ঠেঙিয়ে তুলতে একটু দেরি হল। তারপর প্রথমটা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। 'চার ঘোড়ার গাড়ি আবার কী? এ তল্লাটে কোথাও চার ঘোড়ার গাড়ি হয় না। একটা চার-ঠ্যাংওয়ালা ঘোড়াই দেখতে পাওয়া যায় না। তা আবার চারটে ঘোড়া এক গাড়িতে।' শেষটা ঘোড়ার নালটা দেখে একেবারে থ! 'এই এত বড়ো নাল হয় কখনো ঘোড়ার? হাতি নয় তো? হাতির পায়ে আমি নাল লাগাতে পারব না গুপি দাদা, এই বলে দিলাম।'

আমরা বুঝিয়ে বললাম, 'চলো-না, গিয়ে নিজের চোখেই দেখবে। এত প্রকাণ্ড ঘোড়াই দেখলে কোথায়, যে এত বড়ো নাল দেখবে? চলো, তোমার লোহাটোহা নিয়ে চলো, ওদের খুব তাড়াতাড়ি আছে, দেরি করলে কার যেন প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। মেলা কাগজপত্র নিয়ে চলেছেন। চলো। নাও, ধরো, নালটাও তোমার যন্ত্রের বাক্সে রাখো। ভারী আছে।'

শম্ভু জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। 'বড়ো ঘোড়া যে হয় না তা বলছি না। ফতেপুর সিক্রি গিয়ে আকবরের ঘোড়ার যে বিরাট নাল দেখে এসেছি, তারপরে আর কী বলি।'

কথা বলতে বলতে গলির-মুখে এসে পড়েছি। কিন্তু কোথায় চার ঘোড়ার গাড়ি? চারিদিক চুপচাপ থমথম করছে, পথে ভালো আলো নেই, একটা মানুষ নেই, কুকুর নেই, বেড়াল নেই, কিছু নেই! ডাইনে-বাঁয়ে দু-দিকে যত দূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলাম কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।

রাস্তার আলোর কাছে গিয়ে কী মনে করে শম্ভু যন্ত্রপাতির বাক্সটা খুলে নালটা বের করতে গিয়ে দেখে বাক্সের মধ্যে নালও নেই। তখন শম্ভু ফ্যাকাশে মুখে আমাদের দিকে চেয়ে বলল, 'ও গাড়ি আরও অনেকে দেখেছে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। ওই রাজা বাহাদুর মহারাজা নন্দকুমারের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু সময়কালে পৌঁছোতে পারেনি। তোমরা তাই দেখেছ।' বলে আমাদের একরকম টানতে টানতে ওর বাড়ি নিয়ে গেল। পরদিন সকালে যে-যার বাড়ি ফিরে গেলাম। গুপি আর জাহাজের কথা তুলল না।

পঞ্চমুখী শাঁখ

বটুদের দেশের বাড়িতে একটা প্রকাণ্ড পঞ্চমুখী শাঁখ আছে। শুনেছি শাঁখটা নাকি দেড়-শো বছর ধরে ওদের বাড়িতে রয়েছে। ওর নানারকম গুণটুনও নাকি আছে। আগে রোজ ওর পুজো হত, পুরুতঠাকুর আসত, খাওয়া-দাওয়া হত। তবে সত্তর বছর হল পুজো-টুজো সব বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ওটা বসবার ঘরের তাকের উপর সাজানোই থাকে। দু-পাশে দুটো কাচের ফুলদানিতে কাগজের ফুল থাকে, আর মাঝখানে শাঁখটা পাঁচটা শিং তুলে চকচক করে। রংটা ফিকে কমলা লেবুর মতো, দারুণ ভারী, আর সারা গায়ে কেমন একটু ধূপধুনোর গন্ধ।

গত বছর পুজোর সময় কয়েক দিনের জন্য ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। শাঁখটা দেখে আমি তো অবাক। শাঁখ যে আবার এত প্রকাণ্ড হয় তা আমার জানা ছিল না। ঘরে কেউ ছিল না, আস্তে আস্তে গিয়ে ওর গায়ে একটু হাত বুলোলাম, কী সুন্দর পিছলা-পিছলা মনে হল। এমন সময় পিছন থেকে বটুর ছোটোদাদু বললেন, 'একটু ধরতে ইচ্ছে হয় তো ধরো। কিন্তু খবরদার যেন আবার বাজিয়ে বোসো না, হাঁ, তাহলেই সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। ওটাকে শেষ বাজিয়েছিলেন আমার ছোটো ঠাকুরদা। তারপর থেকে আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তুই যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস, ঠিক ওইখানটিতে তাঁর লাল মখমলের চাপকান, চুড়িদার ইজের আর নাগরা জুতোজোড়া পড়ে ছিল। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে থেকে ছোটো ঠাকুরদা একেবারে বেমালুম নিখোঁজ। সেই থেকে আর ও শাঁখ বাজানো হয় না।'

আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে একটু সরে দাঁড়ালাম। ছোটোদাদু বললেন, 'না বাজানো অবধি কোনো ভয় নেই। ওই শাঁখটা কি এ-বাড়ির জন্য কম করেছে। এ গুষ্টির যা কিছু, একরকম সবই বলতে গেলে, ওই শাঁখেরই দয়ায়। তারপর কেন যে বিগড়ে গিয়ে ও সর্বনাশটি করল কে জানে। দেখিস আবার ফেলে-টেলে দিসনে যেন। আঙুলও ছেঁচে যাবে, আবার কী হতে গিয়ে শেষটা কী হয়ে যাবে।' এই বলে ছোটোদাদু ঘরের কোনা থেকে লাঠিগাছি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পরে বটুর কাছে আরও শুনলাম। সত্যি অদ্ভুত ব্যাপার। দেড়-শো বছর আগে ওদের কে একজন পূর্বপুরুষ মেলা ধারধোর করে শেষটা পাওনাদারদের তাগাদার চোটে সন্ন্যাসী হয়ে সটান রামেশ্বর। সেখানে গিয়ে ওই অত বড়ো মন্দির, যার বারান্দাটাই শোনা যায় চার হাজার ফুট লম্বা আর তার মধ্যে থাকে থাকে তেত্রিশ কোটি দেবতার মূর্তি সাজানো, এইসব দেখে তাঁর মনের একটা ভারি পরিবর্তন হল। গেলেন সমুদ্রের ধারে, স্নান সেরে এক বার পুজো দেবেন।

সে কী বিশ্রী সমুদ্রের ধার, সে আর কী বলব। একেবারে জলের কাছাকাছি পর্যন্ত এবড়ো-খেবড়ো গাছগাছালি, জলে মোটে ঢেউ নেই, তীর ঘেঁষে শ্যাওলা পড়েছে, আর সে যে কী বিশ্রী একটা আঁশটে গন্ধ। কিন্তু মনের বদল হয়েছে, এখন তো আর ওসব ভাবলে চলবে না। বটুর পূর্বপুরুষ একটা গামছা পরে, তারই মধ্যে ঝুপঝাপ করে নেমে পড়লেন। ও মা, পায়ের আঙুলে আবার কুটকুট করে কামড়ায় কীসে? পূর্বপুরুষ সেখান থেকে খানিকটা সরে গিয়ে স্নানের চেষ্টা দেখতে লাগলেন। কিন্তু কী জ্বালা! আবার আঙুলে কীসে কুটকুট করে কামড়ায়! কী আপদ! এ-রকম করলে তো মন বদলানো মুশকিল! পূর্বপুরুষ বিরক্ত হয়ে জল থেকে উঠে পড়লেন।

বালিটুকু পার হবেন, এমন সময় পিছনে একটা সরসর শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেন এ কী কাণ্ড! একটা বিরাট পাঁচমুখী শাঁখ কুকুরবাচ্চার মতো পিছন পিছন আসছে। এখন কী করা যায়! শাঁখটাকে তাড়া দিলেও যায় না। পূর্বপুরুষের শুকনো ধুতির খুটে বাঁধা একটু মুড়ি-নারিকেল ছিল তাই খানিকটা ছুঁড়ে দিলেন, অমনি গুড়গুড় করে এগিয়ে এসে শাঁখটা সেটার উপর চেপে বসল।

তারপর তার সাহস আস্তে আস্তে আরও বেড়ে গেল, একেবারে নাকি কোলে চড়ে বসল। পূর্বপুরুষ তো ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন, কী জানি আবার কামড়াবে-টামড়াবে না তো? ওজনটিও নেহাত কম নয়। যেই-না ওকথা ভাবা, পূর্বপুরুষ একেবারে উঠে দাঁড়ালেন। অমনি শাঁখটাও কোল থেকে গড়িয়ে বালির উপর চিত হয়ে পড়ল। পূর্বপুরুষ অবাক হয়ে দেখলেন, ওটার ভিতর পোকা-টোকা কিছু নেই, একদম ফাঁকা, এমনকী মাথায় একটা ফুটো অবধি রয়েছে। তুলে নিয়ে কানের কাছে ধরলেন, অমনি মাঝসমুদ্রের অগাধ জলের শোঁ শোঁ শব্দ কানে এল, পূর্বপুরুষের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। শাঁখটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একবার একটু ফুঁ দিয়ে বাজাতেই আকাশ-বাতাস জুড়ে গমগম শব্দ উঠল।

মনে ভাবলেন, যদি কিছু টাকা পেতাম, শাঁখটা নিয়ে দেশে ফিরে যেতাম। ধারকর্জ শোধ করে দিয়ে, শাঁখটাকে নিয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত। যেমনি ভাবা, অমনি ঠুক করে পায়ের কাছে কী একটা পড়ল। তুলে দেখেন ময়লা একটা ন্যাকড়ার থলিভরা রুপোর টাকা। পূর্বপুরুষ আর সময় নষ্ট না করে, বুকে শাঁখটাকে জাপটে ধরে, হাতে টাকার থলি নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। তারপর ধারধোর শোধ করে দিয়ে, এই বাড়িটা তৈরি করলেন। শাঁখের জন্য আলাদা একটা ঘর হল, ভারি ধুমধাম করে রোজ তার পুজো হত। আর তার দৌলতে ওদের আর কোনোরকম দুঃখকষ্ট রইল না, কারণ রোজ রাত্রে পুজোর পর একবারটি বাজিয়ে ওর কাছে যা চাওয়া যেত তাই পাওয়া যেত।

বটু এতদূর বলে একবার আমার দিকে তাকাল, তারপর আরও বলল, 'দিনের মধ্যে কিন্তু ওই একবারই ওর কাছে চাওয়া হত, আর যা চাওয়া যেত ঠিক তাই পাওয়া যেত। কিন্তু খুব সাবধানে চাইতে হত, কারণ ঠিক যেমনটি বলা হত, তেমনটি ফলে যেত। কথার একটু নড়চড় হত না। তারজন্য মাঝে মাঝে খুব অসুবিধাও হত। বুড়ি ঠাকুমা শাঁখ বাজিয়ে প্রণাম করে সবেমাত্র উঠেছেন, নাতি-নাতনিরা এমনি জ্বালাতন শুরু করে দিয়েছে যে, ওঁর পানের ডিবের সব পান ক-টি খেয়ে ফেলে, ওঁর হাড় একেবারে ভাজা ভাজা করে তুলেছে। বিরক্ত হয়ে যেই বলেছেন, 'চুলোয় যাক্‌গে সব!' আর যাবে কোথা। ঝুপঝুপ সব রান্নাঘরের উনুনে গিয়ে পড়েছে,

উনুন-টুনুন নিভে একাকার, এখানে ছ্যাঁকা, ওখানে ছ্যাঁকা! তবে মাঝে মাঝে আবার সুবিধাও হয়ে যেত। বেয়াইবাড়ির লোকরা মহা বাড়াবাড়ি লাগিয়েছিল। কিছুতেই মেয়ে পাঠাবে না। বুড়ো ঠাকুরদা সবে পুজো সেরে শাঁখকে বাজিয়ে প্রণাম করে উঠেছেন, এমন সময় যারা মেয়েকে আনতে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে খবর দিল। বুড়োও রেগে বললেন, 'বেয়াই-বেয়ান ফিরিয়ে দিলে বুঝি? যাক্‌গে, মরুকগে।' ব্যস! আর যাবে কোথা। তৎক্ষণাৎ বেয়াই-বেয়ান চোখ তুলে একেবারে অক্কা।'

আমি বটুকে বললাম, 'তবে তুই শাঁখকে বলে একটু অঙ্কের নম্বর-টম্বর বাড়িয়ে নিস-না কেন?'

বটু বলল, 'সে হবার জো নেই। সত্তর বছর থেকে আর ওর কাছে কিছু চাওয়া বারণ।' আমি শাঁখটার আর একটু কাছে এগিয়ে বললাম, 'কেন, চাইলে কী হয়?'

'আরে, কী হয় মানে? ঠাকুরদার ঠাকুরদা যে একেবারে কপ্পুরের মতো উড়ে গেলেন, সেটা বুঝি কিছু নয়?'

যদিও ওর ঠাকুরদার ঠাকুরদা উড়ে গেছেন বলে আমার কিচ্ছুও হয় না, তবু ওদের বাড়িতে আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, তাই আরও কিছু না বলাই ভালো মনে হল।

কিন্তু অমন সুন্দর একটা শাঁখ, এতকাল ঘরে রয়েছে, কাউকে কিছু বলে-টলেও না, তাকেই-বা অত ভয় কীসের ভেবে পেলাম না। একটু হাত দিয়ে সরালাম, কিচ্ছু হল না। দু-হাতে তুলে নিয়ে একটু শুঁকলাম বেশ গন্ধ। কানের কাছে উঠিয়ে নিয়ে শুনলাম, অগাধ সমুদ্রের জল শোঁ শোঁ করছে। কেমন যেন গায়ের লোমগুলো সরসর করে সব খাড়া হয়ে উঠল। শাঁখটাকে আবার নামিয়ে রাখলাম। বটু একটু কাষ্ঠ হেসে বললে, 'দেখিস, বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেললে কিন্তু শেষে কষ্ট পেতে হবে।'

বটুদের পাড়া ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে, বটতলার মাঠে পুজোর সময় যাত্রা হয়। কিন্তু বটুদের বাড়ির লোকরা এমনি যে, কিছুতেই ছেলেদের গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেবে না। বলে নাকি, আমার বাবা শুনলে রাগ করবেন। বাবা এদিকে নিজে— যাক্‌গে সেকথা। বটু বলল, 'অত সহজে ঘাবড়ালে চলবে কেন! দেখই না!' তারপর খাওয়া-দাওয়া সারা হলে, ঘরে গিয়ে খানিক ঘাপটি মেরে থাকলাম। তারপর উঠে পাশবালিশ আর মাথার বালিশ দিয়ে, দুই বিছানায় দুই মানুষ বানিয়ে তাদের গায়ে মাথায় চাদর ঢাকা দিয়ে, মশারি গুঁজে, আলো নিভিয়ে, পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম।

আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। বটু বলল, 'এ তো আমরা বহুবার করেছি। চল, রান্নাঘরের জানলা দিয়ে।'

দূরে যাত্রার ডুগডুগি শোনা যাচ্ছে। আমরা বসবার ঘর পেরিয়ে যাবার সময়, তাকের উপর চোখ পড়ল, অন্ধকারেও শাঁখটা কীরকম জ্বলজ্বল করছে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, পা চালিয়ে এগোলাম।

বাইরে তারার আলোয় সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রান্নাঘরের জানলা বাইরে থেকে ঠেসে দিয়ে, মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড় দৌড়, একেবারে বটতলার মাঠের যাত্রায়।

উঃ, কী ভালোই যে লাগল! কুম্ভকর্ণ যে কী মজাটাই করল! কখন যে রাত কেটে গেল টেরই পেলাম না। ভোরের আগে যাত্রা ভাঙল, বটু আর আমি ঢুলুঢুলু চোখে বাড়িমুখো রওনা দিলাম।

এই পর্যন্ত কোনো গোলমাল হয়নি। কিন্তু রান্নাঘরের জানলা দিয়ে ঢুকেই বটু একটা বালতি না কীসে যেন ধাক্কা খেয়ে, একগোছা থালা ঝনঝন করে ফেলল। তার এমনি আওয়াজ যে, মড়া মানুষরাও উঠে বসে।

কোনোরকমে সেখান থেকে ছুটে বসবার ঘর অবধি এসেছি, আর ততক্ষণে চারদিকে হইচই। ছোটোদাদু লাঠি নিয়ে, টর্চ নিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। ধরলে আর আস্ত রাখবেন না। একবার টর্চটা আমাদের মুখে পড়লেই আমার ছুটিতে মজা মারা সারা! অন্ধকারে শাঁখটা তখনও জ্বলজ্বল করছে। এক দৌড়ে সেটাকে বুকে নিয়ে আস্তে একটু ফুঁ দিলাম। অমনি সারাবাড়িময় গম গম করে উঠল। মনে মনে বললাম, 'এইবার দেখি তোমার কত ক্ষমতা।' ওমা! ওকথা ভাবামাত্র শাঁখটা আপনি-আপনি আমার হাত থেকে সুড়ুত করে ছুটে গিয়ে, একেবারে ছোটোদাদুর পায়ের উপর! আর কী! 'ওরে বাবারে, বোমা ফেলল নাকি রে, মরে গেলাম রে, জল আন রে!' দেখতে দেখতে চারিদিকে লোকজন গিজগিজ করতে লাগল। সেই সুযোগে বটু আর আমি খাবার ঘর থেকে লম্বা।

গুণ করা

বুঝলে, আমার মামাবাড়িতে ফাগু বলে একটা চাকর ছিল। বাঙালি নয়; ওই গারো পাহাড় অঞ্চলে ওর বাড়ি। আশা করি গারো পাহাড় কোথায় সেকথা আর তোমাদের বলে দিতে হবে না। ফাগু যে বাঙালি নয় সে ওকে দেখলেই বোঝা যেত। বেঁটে, মোটা, একমাথা কাঁটা কাঁটা চুল, দারুণ ফর্সা, আর খেত যে, আরে বাপ, দেখলে তোমাদের তাক লেগে যেত। রোজ দু-টি বেলা এক-গন্ধমাদন পর্বত ভাত আর একগঙ্গা জল তার চাই। তাই দেখে আমরা হাসাহাসি করলে আবার সে কী রাগ!

— 'অত হাসবার কী আছে দিদি? জান, আমরা হলাম গিয়ে পরিদের বংশ। আমরা নানারকম তুকতাক ভেলকি মন্তর জানি, একটু না খেলে আমাদের চলবে কেন?'

একদিন আমার মামাতো ভাই নগা বলল, 'দ্যুৎ? পরি আবার হয় নাকি? যত সব বানানো গল্প। চালাকি করবার আর জায়গা পাওনি।' তাই শুনে ফাগু এমনি চটে গেল যে আরেকটু হলেই থালায় একপাহাড় ভাত ফেলেই উঠে যাচ্ছিল। নেহাত অত ভাত খেলে বেড়ালটার অসুখ করতে পারে বলেই গেল না। কোনো কথা না বলে পাহাড়টিকে শেষ করে, এক কলসি জল গিলে, তারপর আবার বলল, 'তোমরা জানই-বা কী আর বোঝই-বা কী? ইস্কুলে গিয়ে কয়েকটা বই মুখস্থ করে নিজেদের সব মস্ত পণ্ডিত মনে কর। বলি, একটা তেঁতুল পাতাকে বাঘ বানিয়ে দিতে পার?'

নগা বলল, 'হ্যাঁ, তুমি পার না তো আরও কিছু! একটা থালা মাজতে পার না, পিসিমার কাছে তাড়া খাও, তুমি আবার বাঘ বানাবে!' ফাগু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আস্তে, খোকাবাবু, আস্তে। বড়োরা শুনতে পেলে আমাকে আস্ত রাখবে না।' নগা বললে, 'কেন, আস্ত রাখবে না কেন?'

—'আরে আমার ঠাকুরদা শুধু যে তেঁতুল পাতাকে বাঘ বানিয়ে দিতে পারত তা নয়, তার উপর সুতো বেঁধে মানুষকে ছুঁচো বানিয়ে দিতে পারত।' 'মানুষকে ছুঁচো বানাত বললেই হল! কক্ষনও মানুষকে ছুঁচো বানাত না।'

ফাগু বলল, 'আহা, ছুঁচো বানাত তো আর বলিনি, বানাতে পারত। খুব দয়ালু ছিল তাই বড়ো-একটা বানাত না। তবে মানুষকে ইঁদুর ব্যাং কাচপোকা বানিয়ে দিতে আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

শুনে আমরা সবাই একেবারে থ মেরে গেলাম। ফাগু আরও বললে, 'আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমাদের পাহাড়ের নীচেকার গাঁয়ের চমরু মোড়ল ঠাকুরদার কাছে টাকা ধার করে শোধ দিচ্ছিল

না বলে, ঠাকুরদা প্রথমে সর্টে পুড়িয়ে তাকে আমাদের বাড়িতে এনে, তারপর তার চারদিকে সুতো বেঁধে মন্ত্র পড়ে, তাকে একটা ব্যাং বানিয়ে, একটা মাটির হাঁড়িতে সরা চাপা দিয়ে রেখে দিলেন। তারপর চমরুর বউ হাঁউমাউ করে কেঁদেকেটে এসে টাকা শোধ করে দিয়ে গেলে, তবে ঠাকুরদা আবার চমরুকে মাথায় ঘুঁটের ছাই মাখিয়ে মানুষ করে দিলেন। ওইজন্যই বার বার বলি, খোকাবাবু, আমার পিছনে লেগ না।'

নগা মাঝে মাঝে ফাগুর মাথার টিকি ধরে টানত কি না, তাই ফাগু ও-রকম বলল। নগা যদিও মুখে বলল, 'হ্যাঃ! উনি সবকিছু করতে পারেন, অথচ দশ টাকা মাইনেতে বাড়িঘর ছেড়ে আমাদের বাড়িতে কাজ করতে এসেছেন!' মুখে একটু চাল দিল বটে কিন্তু টিকিতে হাত দিল না।

ফাগু আস্তে আস্তে উঠে থালা-ঘটি নিয়ে আঁচাতে গেল; যাবার সময় শুধু বলল, 'টাকাপয়সা তৈরি করতে পারি একথা তো বলিনি, খোকাবাবু। সে আমার ঠাকুরদাদাও পারত না। আর সে যা পারত, আমার বাবা অতটা পারত না। আবার আমি পারি আরও কম। তবে একেবারে যে কিছুই পারি না তাও নয়। দেখাব এখন একদিন। এখন তোমরা কেটে পড়ো দিকিনি। চাকর-বাকরদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম মোটেই ভালো নয়।'

বুঝতেই তো পারছ এসব কথা বড়োদের কাছে মোটেই বলবার মতো নয়। তার পরদিন সন্ধ্যে বেলা ফাগু মুঠোর মধ্যে করে কী একটা ছোট্ট লাল বিচি আর একটা তামার আংটি দেখাল। 'কী রে ফাগু, ও দিয়ে কী হবে?' ফাগু বলল, 'আংটি পরে ওটা খেলে, তারপর যদি আমার জানা একটা মন্তর মনে মনে বলা যায় তাহলে যখনই ইচ্ছা হবে তখুনি আমি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারব। এর অনেক বিপদও আছে, কাজেই তোমরা যেন আবার খেতে-টেতে চেয়ো না।' এই-না বলে আমাদের সামনেই টপ করে সেটাকে গিলে ফেলল। আরেকদিন, দেখি পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা তামার মাদুলি বাঁধা। বলে কি না, 'ওটা যতক্ষণ আমার পায়ে পরা থাকবে, ততক্ষণ সব জন্তু-জানোয়ারদের কথা আমি বুঝতে পারি, দিদি।' নগা বিরক্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাই বই কী, এদিকে ক খ পড়তে পারেন না, বাড়িতে চিঠি লিখতে হলে আমাকে এসে খোশামুদি করেন, উনি বুঝবেন জন্তু-জানোয়ারদের ভাষা!'

আমার ছোটো মামাতো বোন টিনা বলল, 'সস্‌প্যান্‌কে বলেন নগজ পানা, রেফ্রিজারেটরকে বলেন ক্যাবেন্ডিস্‌, ইলেক্‌ট্রিককে বলেন লিকটিস, উনি বাঘা পুষিদের কথা বুঝবেন।' ফাগু একটু কাষ্ঠহেসে বলল, 'দেখো দিদি, পরিদের ইংজিরি শিখবার দরকার হয় না, ওই যে কাল মাস্টারবাবু তোমাদের বকতেছিলেন বাঁশ বেয়ে বাঁদর ওঠে বুঝতে পারছিলে না বলে, ও সবও আমাদের শিখতে হয় না। আমাদের দেশে আমি নিজের চোখে দেখেছি বাঁদররা বাঁশ বেয়ে বেয়ে ওঠা-নামা করতেছে। একটুখানি ওঠে আবার একটুখানি করে পিছলে পড়ে যায়, আর রেগে-মেগে সে যা বলাবলি করতেছে, সে আর তোমাদেরকে না বলাই ভালো, কোন ফাঁকে কী শিখে নেবে। হ্যাঁ, কী বলছিলাম, জন্তুদের কথা বুঝি বই কী। এই তো একটু আগে পুষি বলছিল, খোকাবাবু হাত না ধুয়েই পিসিমার বাটি থেকে দুধ চুরি করে ওকে খাইয়ে দিয়েছে। অত হাসছ কী দিদি? কাল বাঘাকে কে ওই পুজোর সময় ছেড়ে দিয়েছিল সেকথাও বাঘার কাছে শুনেছি।'

এর পর ফাগুকে আমরা খুব বেশি ঘাঁটাতাম না। কিন্তু সত্যি ব্যাটার খাওয়ার আর ঘুমের বহর দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। মাঝে মাঝে আমাদের বলত, 'দেখো, দাদা দিদি, তোমরা যদি আমাকে খুশি করতে পার তোমাদের আমি ওই অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মন্তরটা শিখিয়ে দেব।'

আমরা তখুনি ওকে আমাদের পয়সা-কড়ি যার যা হাতে ছিল দান করে বসলাম। 'এবার খুশি হয়েছ তো ফাগু, এবার শিখিয়ে দাও।' ফাগু বলত, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিখিয়ে দেব বই কী। তবে একটা কালো প্যাঁচার চোখের মণি লাগবে। সেটা আনতে পারবে তো?' আমরা সবাই অপ্রস্তুত হয়ে এ ওর দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। শেষে নগা বললে, 'কী যে বল ফাগু, প্যাঁচার চোখ কোথায় পাব? আচ্ছা এই কালো মার্বেলটাতে হবে না?' ফাগু একটু ভেবে বলল, 'তা হতে পারে, পরিদের ছেলে আমি, ওটা শক্ত হলেও আমার পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহলে যে আবার জ্যাঠামশাইএর ওই ভালো তামাকটার এক দলা লাগবে। আর দেখ খোকাবাবু, কাউকে যদি এসব কথা বল তো মন্তর তো হবেই না, বরং পড়া-টড়া যা একটু-আধটু জান তাও সব ভুলে যাবে।' নগা বলল, 'পাগল, পাগল, এসব কথা কাউকে বলি কখনো!'

তামাক পেয়ে ফাগু বলল, 'আজ তো হবে না, খোকাবাবু, আজ সকালে পশ্চিম দিকে ছাগল ডেকেছিল, আজ হবার নয়। কাল বিস্যুৎবার, কাল বাদ দিতে হবে; পরশু একাদশী, পরশু মন্তর-তন্তর করলে ম্যালেরিয়া হয়, সেই গিয়ে একেবারে শনিবার করতে হবে। তা একদিক দিয়ে ভালো হল, সেদিন ছোটোকাকিমাও বাপের বাড়ি থেকে আসবেন, ওনার সঙ্গে সেই দুষ্টু বিজুও আসবে, ওকেও তা হলে শিখিয়ে দিতে পারব। আচার-টাচার চুরি করতে ভারি সুবিধে হবে।'

তাই হল। কোনোরকমে বিস্যুৎ শুক্কুরটা পার করে শনিবার সকালে যেই ছোটোকাকিমার সঙ্গে বিজু এসে উপস্থিত হয়েছে, ধরলাম গিয়ে ফাগুকে। নগা বললে, 'আর চালাকি চলবে না, ফাগু, বলে রাখলাম। যা যা বলেছিলে সব হয়েছে। এবার না শিখিয়ে দিলে কিন্তু বাবাকে বলে-টলে একাকার করব, সে পড়াই ভুলি আর যাই করি।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ রে, সত্যিই তাই। তা ছাড়া এমনিতেই তো প্রায় সব ভুলে গেছিস, মাস্টারমশাই বলছিলেন-না?' খুশি হওয়া দূরে থাকুক নগা আমাকে এক ধমক দিল, 'চুপ। আমি তোর চেয়ে বড়ো-না!' বিজু বললে, 'আহা, তোরা থাম-না। দেখ ফাগু, পড়া-টড়ার জন্য আমি কেয়ারই করি না। জানিই না কিছু, ভুলব কী ছাই! তবে এটুকু বলে রাখি চালাকি করবি তো পিটিয়ে ছাতু করে দেব। তোর চেয়ে ঢের ঢের ভালো লোকদের একেবারে আমচুর বানিয়েছি তা জানিস? যখন শেষটা ছেড়ে দিয়েছি পানের মশলার সঙ্গে তাদের কোনো তফাত থাকেনি। কাঁদতে কাঁদতে সব বাছাধনরা বাড়ি গেছে!'

ফাগু বলল, 'আরে না, না। অত অবিশ্বাস করলে কি চলে, দাদা? আজ সন্ধ্যা বেলায় সুয্যি ডুববার এক ঘণ্টা পরে খুব ভালো সময়। তোরা চার জনে একটা নতুন কাঁসার ঘড়ায় পঞ্চাশটা সন্দেশ, একটা নতুন ধুতি, একটা নতুন গামছা, আংটিটা তো আমার পকেটেই আছে—' বলে ফাগু এ-পকেট সে-পকেট হাতড়াতে লাগল। সব্বনাশ আংটি তো নেই! তার কী হবে! এমনি আংটিতে তো হবে না, ওটা যে মন্ত্রপূত ছিল।'

—'অ্যাঁ ফাগু! শেষ কালটা সব পণ্ড!' বিজু ঘুসি পাকিয়ে বলল, 'দেখ্, চালাকি রাখ, আংটি যখন তুই হারিয়েছিস তোকেই ব্যবস্থা করতে হবে। এক মিনিট সময় দিলাম। ফাগু কাঁদো-কাঁদো মুখ করে বলল, 'লাল পাথর-বসানো বড়ো সোনার আংটি একটা হলেও চলে যায়। তা সে আমি কোথায় পাব?' বিজু একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা, সে আমি দেব'খন। কিন্তু অদৃশ্য হতে শেখাতে হবে।'

ফাগু বলল, 'সে আর বলতে। ঠিক সাড়ে ছ-টার সময় ওই জিনিসগুলো নিয়ে, গোয়াল ঘরের পিছনে ওই খালি গুদোম ঘরটাতে তোমরা এসো। আগে আমি নিজে অদৃশ্য হয়ে দেখব পারি কি না, আংটিটার জন্যই একটু ভাবছি। তারপর তোমাদের শিখিয়ে দেব। তবে কী জানেন

দাদাবাবু, এসব বড়ো শক্ত খেলা, এইটুকু ভুল করেছি তো সর্বনাশ! হয়তো চিরটা কালের মতোই উবে যাব, হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যাব।' বিজু বললে, 'ন্যাকামো রাখ্! সাড়ে ছ-টাই ঠিক রইল।'

সন্ধ্যে বেলা বড়োরা সিনেমা দেখতে গেলে, বিজু ছোটোকাকিমার সঙ্গে এসেছিল ওঁর বিয়ের ঘড়া, তত্ত্বর সন্দেশ, ধুতি, গামছা আর নিজের নতুন লাল পাথরের আংটি, এইসব নিয়ে আমাদের সঙ্গে গুদোম ঘরে গেল। সেখানে ফাগু অপেক্ষা করছিল। কাউকে বলিসনি তো তোরা? তাহলে কিন্তু মন্তর ফলবে না। 'আরে না, না, এবার শুরু কর।' ফাগু ঘরে ঢুকে বলল, 'তোমরা একটু বাইরে দাঁড়াও, গোপনে মন্তরটা সড়োগড়ো করতে হয়।' বলে জিনিস নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বাইরে আমরা বসে আছি তো বসেই আছি। আধ ঘণ্টা গেল, এক ঘণ্টা গেল, চার দিক দিয়ে এমনি অন্ধকার হয়ে এল যে আর কী বলব। তারপর বড়োরা তো সাড়ে আটটার পর এসে হাজির হবে, তখন তো আর কিছু হবার জো নেই। এত দেরি করলে মন্তর শিখব কখন! শেষটা বিজু কাঁধ দিয়ে দরজা ঠেলে খুলে ফেলে দিল। গিয়ে দেখি সব ভোঁ ভোঁ! ফাগু ও জিনিসপত্র সব ডিস্যাপিয়ার্ড!

ভেবেই পেলাম না কী হল। ব্যাটা মন্তরই ভুল করে চিরকালের মতো হাওয়াই হয়ে গেল, না কি— আমরা সবাই গুদোম ঘরের দেয়ালের ছোটো জানলাটার দিকে একবার তাকালাম। খালি বিজু একটু মাথা চুলকে বলল, 'আমি আবার আমার বন্ধু জগাইয়ের কাছে খানিকটা খানিকটা বলেছিলাম, সেইজন্যই কি বেচারা শেষটা হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল নাকি?'

পরে গোলমাল হয়েছিল বই কী, আংটির কথা কেউ না জানলেও ঘড়া নেই, সন্দেশ নেই, কাপড় নেই, ফাগু নেই। গোলমাল হবে না? তবে ফাগুকে পাওয়া যায়নি।

দিনের শেষে

লখনউ থেকে ওস্তাদ এসেছে। দাদু আর দিদিমা শ্যামলবাবুদের বাড়িতে গান শুনতে গেছেন, ফিরতে রাত হবে।

ঝগড়ু বললে, 'তা তোমরা যদি সবকিছুই বিশ্বাস না করে আনন্দ পাও, তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই। তবে সর্বদা মনে রেখো, বোগিদাদা, যা বিশ্বাস করবার মতো নয়, তা যে সত্যি করে হয় না, এ-রকম কোনো কথা নেই।'

ঝগড়ু রাগ করে উঠে দাঁড়াল। ওর পেছনে কুচি কুচি ঘাস লেগেছিল, তার কতকগুলো ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। তাই দেখে বোগি নরম গলায় বললে, 'তাই বলে ঘুটঘুটে অন্ধকারেও মানুষ চোখে দেখতে পায়, সেকথা কী করে বিশ্বাস করি? অসম্ভব জিনিস যে হয় না, ঝগড়ু।'

ঝগড়ু আরও রেগে গেল। 'অসম্ভব বলেই সে-জিনিস হবে না? এ কি একটা কাজের কথা হল, বোগিদাদা?'

বাগান যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা মরচে-ধরা কাঁটাতারের বেড়া। তার পরেই রেলের লাইনের বাঁধ আকাশ পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে। দুপুরে দুখু ঘাস কেটেছে, যেখানে-সেখানে কুচি কুচি ঘাস পড়ে আছে; পাখিরা সব বাসায় ফিরে আসছে; শ্যামলবাবুদের গোয়ালে এখন গোরু দোয়া হচ্ছে। বাঁধের ওপারে কিছু দেখা যায় না; বাঁধের উপরে একটা ন্যাড়া মনসার ঝোপ কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে; পিছন দিকে সূর্য ডুবে যাচ্ছে।

কারো মুখে কথা নেই। কানে এল একটা শব্দ, টংলিং টংলিং টংলিং। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চেন-শেকল ঝোলাতে ঝোলাতে একটা মালগাড়ি বাঁধের উপর দিয়ে চলে যেতে থাকে।

যেই সূর্যের সামনে আসে, অমনি সেই গাড়িটা কুচকুচে কালো হয়ে ফুটে ওঠে। শেষ গাড়িটার দু-দিককারই বড়ো টানা দরজা খোলা। সেই খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে ওপারের সূর্যটাকে এই মস্ত হয়ে দেখা গেল। আর দেখা গেল, সূর্যের সামনে গাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, কালো পাতলা ছিপছিপে একটা মানুষ। তার মাথার উপর খাড়া দুটো শিং।

বোগি, রুমু, ঝগড়ু কেউ আর কথা বলে না। ঠিক সেই সময় বাঁধের পিছনে সূর্যও টুপ করে ডুবে গেল। আর অমনি চারদিক ধোঁয়া ধোঁয়া আবছায়া হয়ে উঠল। শীত শীত মনে হতে লাগল। বকের মতো একটা সাদা পাখি কোঁ-ও-ও-ও কোঁ-ও-ও-ও বলে ডাকতে ডাকতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। ঝগড়ু উঠে পড়ে গা ঝাড়া দিয়ে নিল, 'আর নয়, এখন ভিতরে চলো।'

রুমু বললে, 'ঝগড়ু, লুচি ভাজতে বলো-না, আমার খিদে পেয়েছে।'

ঝগড়ু রান্নাঘরের দিকে চলে যেতেই বোগি বললে, 'স্—স্—স্, দেখ।'

বাঁধের ধার বেয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে নেমে, এক লাফে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে, শিংওয়ালা লোকটা একেবারে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর পিঠে একটা লম্বা ঝোলা।

—এই, শোনো! আমাকে লুকিয়ে রাখবে?' বোগি রুমু ওর মুখের দিকে তাকায়, এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

লোকটা বললে, 'আমার পা ব্যথা করছে, তেষ্টা পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে। রাখবে লুকিয়ে? তাহলে তোমাদের জাদু পড়া, গুণ করা, ভেলকিবাজি সব শিখিয়ে দেব। দেখবে?' বলেই লোকটা দিদিমার মা'র হাতে-লাগানো সাদা গোলাপ ফুলের ঝোপের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে ডেকে বলল, 'এই দেখো।' বলে টুপ করে একবার বসেই আবার উঠে দাঁড়াল। বোগি রুমু অবাক হয়ে দেখলে— কোথায় কালো পোশাক, কোথায় শিং। সাদা চুল, সাদা দাড়ি, সাদা পোশাক, মাথায় মুকুট। লোকটা একটু হেসে আবার টুপ করে একবার বসেই উঠে পড়ল। আবার কালো পোশাক, মাথায় শিং যে কে সেই।

বোগি রুমু উঠে একবার গোলাপ গাছের পিছনটা ভালো করে দেখে এল। কোথাও কিছু নেই।

—কী দেখছ, দিদি? ভেলকি লাগিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ঠকাই না।'

বোগি বললে, 'এসো, তোমাকে লুকিয়ে রেখে দেব, শোবার জন্য দড়ির খাট দেব, জল খেতে দেব, কিন্তু আমাদের অন্ধকারে দেখতে শিখিয়ে দিতে হবে, মাটিতে কান পেতে এক মাইল দূরে বনের মধ্যে হরিণ-চলা শুনতে শিখিয়ে দিতে হবে।'

রুমু বললে, 'আর সেই?'

লোকটা অবাক হয়ে বসলে, 'কী সেই, দিদি?'

—'সেই যে, বাঁশি বাজালে জন্তু-জানোয়ার বশ হয়?'

—'হ্যাঁ, তা-ও শিখিয়ে দেব, চোখের সামনে আমের আঁঠি থেকে আম গাছ করে তাতে ফল ধরাতে শেখাব, দড়ি বেয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে শেখাব—'

বোগি বললে, 'ধ্যেত!'

লোকটা বললে, 'ধ্যেত? এই নাও ধরো।' বলেই পাশের পেয়ারা গাছ থেকে একটা প্রকাণ্ড নীল রঙের কাকাতুয়া ধরে দিল।

বোগি ঢোক গিলে বললে, 'চলো।' লোকটা তক্ষুনি নীল পাখিটাকে অন্ধকারে উড়িয়ে দিল। বলল, 'হরিণ-চলার শব্দ আর এমন কী। আমাদের মণিপুরে তুঁতফলের গাছে রেশমি গুটির শুঁয়োপোকারা থাকে। রাত্রে যদি গাছতলায় দাঁড়াও, ওদের পাতা চিবুনোর শব্দ শুনতে পাবে।'

দূরে রান্নাঘরের আলো দেখা যাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে লোকটা বললে, 'আমার মা দুধ দিয়ে কমলালেবু দিয়ে মেখে শীতের রাত্রে বাইরে রেখে দিত, আর পাহাড় দেশের বেঁটে মানুষরা এসে সেসব খেয়ে যেত। তাই আমাদের কোনো অভাব থাকত না।'

রুমু বললে, 'তুমি তাদের দেখেছ?'

বোগি বললে, 'রুমু, বোকার মতো কথা বোলো না।'

দুখু ভূতের ভয় পায়, মালীর ঘরে থাকে না। ঘরের পাশে জলের কল আছে। তাই শিংওয়ালাকে ওরা সেখানে থাকতে দিল। 'যাও, ঢুকে পড়ো। ঝগড়ু দেখলে আবার মুশকিল হবে।'

লোকটা একটু ইতস্তত করে বললে, 'একটা মোমবাতি হলে হত না? যদি ইয়ে— মাকড়সা-টাকড়সা থাকে?'

বোগি বললে, 'তবে-না বললে, অন্ধকারে দেখতে জান?'

সে বললে, 'আহা, আমি দেখতে পারি কখন বললাম? বলেছি, তোমাদের শিখিয়ে দেব। আমার অন্ধকারে ভয় করে।'

রুমু বললে, 'দাদা, দাও-না তোমার নতুন টর্চটা ওকে।'

রান্নাঘরের বারান্দা থেকে ঝগড়ু ডাকল, 'বোগিদাদা— আ— আ, রুমুদিদি—ই—ই।' আর অমনি ওরাও লোকটার হাতে টর্চ গুঁজে দিয়ে ধুপধাপ দৌড় লাগাল।

সব শেষের পেটফোলা গরম লুচিটা লাল কাশীর চিনি দিয়ে খেতে হয়। রান্নাঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওরা মুখ ধোয়। যেখানে মুখ ধোয়া জল পড়ে, সেখানে একটা মস্ত লঙ্কা গাছ হয়েছে। দুখু বলেছে, ওকে কেউ লাগায়নি, আপনা থেকেই হয়েছে। তাতে ছোট্ট ছোট্ট তারার মতো সাদা ফুল ফুটেছে আর রাশি রাশি লাল টুকটুকে লঙ্কা ঝুলে রয়েছে। মাথার উপর আকাশটার ঘন বেগনি রং, কিন্তু দূরের আকাশ আলো হয়ে রয়েছে; কালো বাঁধের উপর দিয়ে কালো শুঁয়োপোকার মতো একটা মালগাড়ি যাচ্ছে। টং লিং, টং লিং, টং লিং করে চেন-শেকল ঝোলাতে ঝোলাতে।

শুনে শুনে ঘুম পায়। রুমু বায়না ধরে, আজ কিছুতেই একলা শোবে না। ঝগড়ু বিড়বিড় করে কীসব বলতে বলতে বোগির খাটে ওর বালিশটা দিয়ে দেয়। বোগির কানে কানে রুমু বলে, 'দাদা!'

—'কী, রুমু?'

—'ওর যদি ভয় করে?'

বোগি কোনো উত্তর দেয় না। তারপর বিরক্ত হয়ে বলে, 'ও কী রুমু, আবার কান্নার কী হল?'

—'ওঘরে মাকড়সা আছে দাদা, আমি দেখেছি।'

বোগি বললে, 'ওকে টর্চ দিয়েছি তো, রুমু।'

—'ঝগড়ুর ঘরে অনেক জায়গা।'

ঝগড়ু বললে, 'কী কানাকানি হচ্ছে। ওসব ভালো নয় বলে দিচ্ছি। কী, লুকোচ্ছে কী! আজ গল্প শুনবে না?'

বোগি বললে, 'তুমি যাও-না, তোমার কত কাজ বাকি আছে। যাও-না রান্নাঘরে।'

কিন্তু ঝগড়ু কিছুতেই যাবে না। চৌকাঠের উপর বসে পড়ল। 'অসম্ভব জিনিস হয় না বলে?'

বোগি পাশ ফিরে শুল। 'হয়, ঝগড়ু হয়, আমি ভুল বলেছিলাম।'

ঝগড়ু রাগ করে আলো নিভিয়ে সত্যি করেই চলে যাচ্ছে দেখে রুমু হাত বাড়িয়ে ওর ফতুয়ার পকেটে গুঁজে দিল।

—'কী করো দিদি, তামাকের গন্ধ হবে হাতে। কী, চাও কী?'

—'অসম্ভবের গল্প বলো ঝগড়ু।'

ঝগড়ু খাটের পায়ের দিকের রেলিং ধরে দাঁড়াল। 'তোমরা হয়তো বলবে পরশপাথরও অসম্ভব?'

বোগি গায়ের ঢাকা খুলে ফেলে উঠে বসল। 'পরশপাথর অসম্ভব জিনিস নয়? পরশপাথর থাকলে এত গরিব লোক হবে কেন?'

রুমু বললে, 'তুমিই তো বলেছ, এত গরিব যে, বিচিসুদ্ধু কুল ছেঁচে খায়।'

ঝগড়ু বললে, 'বেশ, তাহলে পৌষ মাসের সন্ধ্যা বেলায় কম্বল গায়ে দিয়ে বুড়ো লোকটা আমার ঠাকুরদার কাছে আসেনি।' ঝগড়ু আবার উঠে দাঁড়াল।

—'না, ঝগড়ু না, দাদা কিচ্ছু জানে না, তুমি বলো।'

ঝগড়ু শুরু করলে, 'চারদিক চাঁদের আলোয় ঝিমঝিম করছে এমন সময় সে লোকটা এল। বলল, 'খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।' ঠাকুরদা বললেন, 'কোত্থেকে দেব, এ-বছর অজন্মা, আমাদেরই খাবার কুলোয় না, মুরগি সব মরে গেছে, শাল কাঠ ভালো দরে বিকোয়নি, দেব কোত্থেকে বল?' লোকটা বললে, 'তোমাদের এ বেলাকার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?' 'না।' 'বেশ, তবে তোমার ভাগটাই নাহয় দাও আমাকে।' বাড়িতে যা ছিল চেঁচেপুঁছে ঠাকুরদা সব তার সামনে ধরে দিলেন। বলেছিল তো, দুমকার ব্যাপারই আলাদা। লোকটা দাওয়ায় বসে বাড়িসুদ্ধ সবাকার ভুট্টা দিয়ে ভাত দিয়ে সেদ্ধ সবটুকু খেল, তারপর আমাদের পাহাড়তলির কুয়োর মিষ্টি জলও এক ঘটি খেল। তারপর আঁচিয়ে উঠে ট্যাক থেকে একটা হরতুকি আর একটা ছোট্ট কালো পাথর বের করে হরতুকিটা মুখে ফেলে বলল, 'বড্ড অভাব তোমাদের, তাই না?' বলে পাথরটা দিয়ে পাথরের বড়ো থালাটাকে ছুঁয়ে দিল, অমনি থালাসুদ্ধু সোনা হয়ে গেল।

'সকলে তো থ! বুড়ো লোকটিও কালো পাথরটাকে ট্যাঁকে গুঁজে জঙ্গলের দিকের পথ ধরল। তখন সকলের চোখ চকচক করে উঠল, সোনা থাকলে দুর্ভিক্ষেরও কোনো ভয় থাকবে না। চারদিক থেকে একটা 'ধর, ধর', 'গেল, গেল' রব উঠল। বুড়ো লোকটি এক বার ওদের মুখের দিকে তাকাল, তারপর একটা লাফ দিয়ে হরিণ হয়ে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।'

বোগি রুমু কিচ্ছু বলল না।

ঝগড়ু বললে, 'বলো এ-ও অসম্ভব।'

বোগি বালিশে মুখ গুঁজে বললে, 'অসম্ভব হবে কেন?'

ঝগড়ু তো অবাক! এমনি সময় দাদু আর দিদিমা শ্যামলবাবুদের বাড়ি থেকে ফিরে এলেন। 'সে এক কাণ্ড শুনে এলাম রে। রামহাটি স্টেশনে কে একটা জাদুকর নানারকম খেলা দেখাচ্ছিল, দেখতে দেখতে দারুণ ভিড় জমে গেল, তারপর কী নতুন খেলা দেখাবে বলে সে এর ঘড়ি ওর আংটি, তার টর্চ সব নিয়ে দে লম্বা! ওই ভিড় স্টেশনের মধ্যে একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেল, সবাই মিলে আঁতিপাঁতি খুঁজেও তার টিকিটি পেল না। কিন্তু তোদের ঘুমুবার সময় হয়ে গেছে, তোরা এখন ঘুমো।'

অনেকক্ষণ পরে রুমু বললে, 'দাদা!'

—'কী?'

—'টর্চ তো ছিল না ওর কাছে।'

বোগি চুপ করে রইল। রুমু আবার ডাকল, 'দাদা!'

—'কী বল?'

—'ওর কপাল কেটে গিয়েছিল।'

বোগি বললে, 'আঃ, রুমু, ফের কাঁদছ কেন?'

—'রক্ত বেরোচ্ছিল যে দাদা, টর্চের আলোতে দেখলাম।'

বোগি রুমুর পিঠে মুখ গুঁজে চুপ করে শুয়ে রইল।

ঘড়ির শব্দ দূরে সরে যেতে লাগল। আরও দূরে বাঁধের উপর মালগাড়ি যাচ্ছিল টংলিং টংলিং টংলিং।

পরদিন সকালে মালীর ঘরে গিয়ে বোগি রুমু দেখল, দড়ির খাটে টর্চটা রয়েছে, আর একটা ছোটো বাঁশি। লোকটা নেই।

বনের ধারে

ছোটোবেলায় পাহাড়ে দেশে থাকতাম। চারদিকে ছিল সরল গাছের বন। তাদের ছুঁচের মতো লম্বা পাতা, সারা গায়ে ধুনোর গন্ধ, একটুখানি বাতাস বইলেই শোঁ শোঁ একটা শব্দ উঠত। শুকনো সময় গাছের ডালে ডালে ঘষা লেগে অমনি আগুন লেগে যেত; সরল গাছের ডালপালা ভরা সুগন্ধ তেল, সেও ধু ধু করে জ্বলে উঠত। বাতাসের মুখে সেই আগুন ছুটে চলত, মাইলের পর মাইল পুড়ে ছাই হয়ে যেত। ঘন সবুজ বন মাঝে মাঝে পুড়ে ঝলসে থাকত।

বনের ধারে যারা বাস করত তাদেরই হত মুশকিল। আগুনের দাপাদাপি বন্ধ করবার জন্য পাহাড়ের গোড়া থেকে চুড়ো পর্যন্ত, অনেকখানি জায়গা জুড়ে, গাছপালা কেটে ফেলে, চওড়া একটি ঘাসজমি করে রাখা হত। তার একদিকে আগুন লাগলে, অতখানি খোলা জায়গা পার হয়ে অন্য ধারে আগুন পৌঁছোনো শক্ত হত।

পাহাড়ের বাসিন্দারা ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে আগুনের সঙ্গে লড়াই করত। এক পাহাড়ের মাথা থেকে উঁচু গলায় কু—উ—ই—ই বলে ডাক দিত। পাহাড়-দেশে এক চুড়ো থেকে আরেক চুড়োয় মানুষের পৌঁছতে হলে অনেক খানাখন্দ বন-বাদাড় ভেঙে যেতে হত, কিন্তু শব্দ পৌঁছোত এক নিমিষে। অমনি যত গাঁ খালি করে, সবাই মিলে, পাতাসুদ্ধ গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত পিটিয়ে পিটিয়ে আগুন নেভাতে।

আর বনের যত পশুপাখি, তারা সব দলে দলে বন ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করত। বনের জানোয়ার আগুনকে যত ভয় করে, আর কিছুকে ততটা করে না। অন্য জানোয়ারের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা যায়, গাছের ডাল-পাতার রঙের সঙ্গে গায়ের রং মিশিয়ে দিয়ে। অন্য জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করা যায়, নখ দিয়ে, শিং দিয়ে, খুর দিয়ে, দাঁত দিয়ে। কিন্তু আগুনের কাছ থেকে পালানো ছাড়া আর উপায় থাকে না।

অন্য সময় জন্তু-জানোয়ারদের ভারি গর্ব; তাদের হারাতে গিয়ে মানুষকে নাস্তানাবুদ হতে হয়। একটা পাখি ধরবার জন্য কায়দা কত, একটা হরিণ মারবার জন্য কত তোড়জোড়। তাও সামনাসামনি সোজাসুজি নয়, লুকিয়ে জাল পেতে, খাবার দিয়ে ভুলিয়ে তবে-না পাখি ধরে; বন্দুক নিয়ে, শিকারি নিয়ে, বন পিটিয়ে তবে-না জানোয়ার মারে। আর তারা লড়ে খালি হাতে, শুধু তাদের জানোয়ারের বুদ্ধি আর জানোয়ারের শক্তি দিয়ে। কিন্তু আগুনের কাছে তাদের সব গর্ব খাটো হয়ে যায়। হুড়মুড় করে কাচ্চা-বাচ্চা বুকে চেপে, তারা বন থেকে বেরিয়ে পড়ে।

তবে পাহাড়-দেশের লোকেরা আগুন লাগার সময় জানোয়ার মারত না, সবাই মিলে আগুনের সঙ্গে লড়ত।

আমাদের দুধ দিত ডোরাক; শুকনো বুড়ো, মাথায় পশমের পাগড়ি বাঁধা, দু-কানে দু-টি পলা পরা। তার বাড়ি ছিল বনের ধারে, ঘাসজমির গা ঘেঁষে। ঘাসজমির ঢালুতে তার গোরু-ছাগল চরত। তাদের গলায় ঘণ্টা বাঁধা থাকত, সারা দিন পাহারা দিতে হত। বনের মধ্যে কত জানোয়ারের বাস কে তার খবর রাখে। তবে বড়ো জানোয়ার থাকলেও টের পাওয়া যেত না। ডোরাক বলত সহজে ওরা খোলা জায়গায় মানুষের বাসের কাছে আসে না, যদি-না খিদের তাড়নায়, কী তার চেয়েও প্রবল কোনো রাগের বশ হয়ে আর সব ভুলে যায়।

একবার ডোরাক আমাদের ওই বনের মধ্যে নিয়ে গেছিল। চারদিকে শীতের শেষের রোদ ঝিলমিল করছে, কিন্তু বনের মধ্যেটা ঘন ছায়ায় ঢাকা, পায়ের নীচের মাটিটা স্যাঁৎসেঁতে, তার ওপর সরল গাছের পাতা পড়ে পুরু গালচের মতো হয়ে রয়েছে। সরল গাছের মিষ্টি ধুনোর গন্ধের সঙ্গে, কেমন একটা জানোয়ারদের উগ্র গন্ধ মিশে রয়েছে, কিন্তু কোথাও কাকেও দেখা যাচ্ছে না।

গাছের গোড়ায় প্রকাণ্ড সব ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, ডালে ডালে ফিকে সবুজ আগাছা বুড়ো মানুষের দাড়ির মতো ঝুলে রয়েছে; ধরে একটু টানলেই পড় পড় শব্দ করে শেকড়সুদ্ধু উঠে আসে।

সেখানে ফিসফিস ছাড়া কথা কইতে ইচ্ছে করে না। ডোরাকের কানে কানে বললাম, 'তারা কোথায়?'

ডোরাক আমাদের শুকনো পাতা দিয়ে মোড়া গাছের কোটর দেখাল। পাথরের ফাটলে নরম শুকনো শ্যাওলার বিছানা দেখাল। মাথার অনেক ওপরে গাছের ডালে পাতার মধ্যে অন্ধকারের ভেতর জটা মতন দেখাল। তার বেশি কিছু নয়। দূর থেকে অনেক বার যেন চকচকে চোখ দেখেছিলাম, কাছে গেলেই কিছু নয়; বোধ হয় যে যেখানে চোখ বুজে, ডানা মুড়ে বসে থাকে। মানুষকে তারা বড়ো ভয় করে।

বনের মাঝে মৌ গাছ দেখলাম। সে কোনো একরকম গাছই নয়। ঝাউ গাছ, সরল গাছের মাঝখানে একটা মস্ত মরা গাছ, ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে, একটাও পাতা নেই। কিন্তু গাছের খাঁজে খাঁজে ফাটলে ফোকরে শত শত মৌচাক। আর চারদিকে মৌমাছিদের সে কী গুঞ্জন, কান যেন ঝালাপালা হয়ে গেল।

ডোরাক ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে আমাদের সাবধান করে দিল। কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে বললে, 'ও গাছের সন্ধান এখনও কেউ পায়নি। জানলেই দলে দলে এসে, গভীর রাতে গাছের গোড়ায় আগুন দিত। মৌমাছিরা অমনি অন্ধের মতো সব চাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত, আর মানুষরাও সমস্ত মধু লুটেপুটে নিয়ে যেত।' ডোরাক বললে, 'তোমরাও যেন কারো কাছে মৌ গাছের গল্প কোরো না। তাহলে লাখ লাখ মৌমাছির প্রাণ যাবে, মৌ গাছ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

পাথরের ফাঁকে ডোরাক দেখাল সবুজ সাপ ঘুমুচ্ছে। গায়ের আঁটো চকচকে খোলসটা ঢিলে হয়ে গেছে। ডোরাক বললে, 'সারা শীতকাল ঘুমুবে সাপটা।' বললে, একসময় নাকি পুরোনো খোলসটা ছেড়ে দেবে, নতুন খোলস গজাবে। ক-দিন শরীরটা নরম তুলতুলে হয়ে থাকবে, একটু কিছুতেই ব্যথা লাগবে; তারপর নতুন খোলসটাও আঁটো, শক্ত, মজবুত হয়ে উঠবে। বললে, ভালুকরাও নাকি সারা শীত ঘুমিয়ে কাটায়।

ডোরাক আমাদের ওর বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেছিল, বাইরে দড়িতে শুঁটকিমাছ শুকুতে দিয়েছে দেখেছিলাম। বনের ধারে বাড়ি, উঠোন পেরুলেই ঘাসজমি, তার ওপারে ঘন বন। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আমরা কচি ছোলা মধু দিয়ে খেলাম।

তার আগের বছর ওই বনে আগুন লেগেছিল, তিন দিন ধরে কেউ নেভাতে পারেনি। মাথার ওপর আকাশটা রাঙা হয়েছিল। বাতাসের সঙ্গে ছাই উড়ে এসে ডোরাকের বাড়ির দাওয়াতে পড়ছিল। আগুনের আঁচ পেয়ে ডোরাকের গোরু-ছাগল পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল। তাদের আর কিছুতেই বেঁধে রাখা গেল না। প্রথমটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কাঁপতে থাকল, তারপর লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, খুঁটি উপড়ে, বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। ডোরাকের বউ বলছিল, কাছে পিঠে আগুন লাগলে জন্তু-জানোয়ার বেঁধে রাখতে হয় না।

খুব কাছে আসতে পারেনি আগুন। পাড়ার সবাই মিলে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে আগুন ঠেকিয়েছিল। ডোরাক এত ক্লান্ত হয়ে গেছিল যে, ঘুরে ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। দিক ঠাওর করতে পারছিল না। হঠাৎ দেখে বনের মধ্যে খানিকটা জায়গা ফাঁকা। হয়তো অন্য বছরের আগুনে অনেক গাছ পুড়ে গেছিল সেখানকার, তাদের জায়গায় চারাগাছ কয়েকটা বেরিয়েছিল, তবে চারা তেমন বাড়েনি।

খানিকটা দম নেবার জন্য ডোরাক সেখানে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর একটু বসেছিল। এমনি সময় হুড়মুড় করে বন থেকে অনেকগুলি জানোয়ার বেরিয়ে এল। তার মধ্যে একটা কালো ভালুকও ছিল, তার বুকে একটা ছানা।

খোলা জায়গায় এসে তারা থমকে দাঁড়াল, তারপর হয়তো মানুষ দেখেই যে যেদিকে পারে ছুটে পালাল। দিনের আলো কমে এসেছে, ডোরাক তাদের ভালো করে নজর করতে পারল না। কিন্তু মা ভালুকটা সামনে পড়ে গেছিল, সে একেবারে পাথর বনে গেল। ছানাটা অমনি কুঁই কুঁই করে উঠল, ভালুক হঠাৎ চমকে উঠে তাকে ফেলে, নিমেষের মধ্যে কীরকম একটা চিৎকার করে, আবার জ্বলন্ত বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কোথায় গেল তার নিজের ছানা?

ডোরাক অবাক হয়ে দেখল, এটা ভালুকছানা নয়। নিদারুণ ভয়ে ভালুকটা ভুল করে আর কারো ছানা তুলে নিয়ে এসেছে। কুকুরছানার মতো শুঁকে শুঁকে বাচ্চাটা একেবারে ডোরাকের কোলের কাছে এসে হাজির।

ডোরাক তাকে বুকে করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। তার বুক, পেট, পায়ের ভেতর দিকটা নরম সাদা রোঁয়ায় ঢাকা, ওপরটা ফিকে হলুদ, তাতে মিহি একটু কালোর ছোপ ছোপ লেগে রয়েছে, মাথাটা গায়ের তুলনায় যেন একটু বড়ো মনে হল।

চিতা বাঘের ছানা। দু-পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডোরাকের হাঁটু চাটে। দুধ ছাড়া কিছু খায় না। ডোরাকের বউ কোলে নিলে তার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বোধ হয় মাকে খোঁজে। বউয়ের মনটা কেমন করে। রাতে ডোরাকের কম্বলের তলায় ঢুকে ছানাটা ঘুমোয়।

তিন মাস ছিল ছানাটা। বেশ বড়ো হয়ে উঠেছিল, সারা গায়ে মোলায়েম কালো চাকা চাকা দাগগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটেছিল। বাড়িময় একটা বাঘ বাঘ গন্ধ লেগে থাকত। বাইরের কুকুররা আর ভেতরে এসে জ্বালাতন করত না।

ছানাটাকে ওরা নিরামিষ খাওয়াত, দুধ, ভাত, ডাল, তরকারি। পাকা কলা খেতে ভারি ভালোবাসত। টক দইয়ের সগে পাকা কলা মেখে দিলে চেটেপুটে খেয়ে, ল্যাজ নেড়ে-টেড়ে একাকার করত।

বউয়ের বাবার নব্বুই বছর বয়স, লাঠি ভর দিয়ে পাহাড়ময় টুকটুক করে ঘুরে বেড়াত। সে বলত, বাঘ পোষা যে সে কম্ম নয়। খবরদার যেন, রক্তের স্বাদ না পায়; শিরার ভেতরকার ঘুমোনো আগুন যেন জ্বলে না ওঠে।

এমনিধারা কথা বলত বুড়ো। আর ছানাটা উনুনের পাশে শুয়ে শুয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত। হলদে চোখের পেছনে মনে হত কে যেন বাতি জ্বেলেছে। কিচ্ছু বলত না কাকেও। মুরগিছানাগুলো ওকে একটুও ভয় পেত না, ওর পিঠে চড়ত।

ততদিনে শীত কেটে গেছে। চারদিকের পাহাড়গুলো সবুজ হয়ে উঠেছে। ন্যাড়া গাছে পাতার কুঁড়ি সব খুলে গেছে। রোদ ঝিকমিক করছে। সর্বজয়া গাছে কলি ধরেছে। দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস দিচ্ছে। প্রজাপতিরা উড়ছে।

সারা সকাল ছানাটা বনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত। দুপুরে দই-ভাত না খেয়ে, কালো মুরগিটাকে ধরে সকলের চোখের সামনে কড়মড় করে খেয়ে ফেলল। কেউ বাধা দেবার আগেই কম্ম শেষ।

ডোরাকের বউ কেঁদেকেটে সারা; ওর মানতকরা কালো মুরগি, বাড়িতে এবার অকল্যাণ হবে। রাগ করে শেকল দিয়ে ছানাটাকে বেঁধে রাখল। রাতেও তাকে ঘরে তুলল না। শুল না সারাদিন ছানাটা, খালি বনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল। পরদিন সকালে দোর খুলে বউ দেখে রাতে কখন শেকল ছিঁড়ে সে পালিয়ে গেছে।

ডোরাকের কাছে গিয়ে বউ কেঁদে পড়ল, 'যেমন করে পার, আবার ধরে আনো, আমি ওকে বেঁধে রাখব, মাংস খেতে দেব।'

ডোরাক শুধু মাথা নাড়ল।

বউয়ের বুড়ো বাবা বলল, 'আমাদের জঙ্গল-দপ্তরের দরজার ওপর লেখা আছে, 'বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায়, কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না'।'

বাঘের চোখ

অঙ্কের ক্লাসে আমার বন্ধু গুপির সব অঙ্ক ভুল হল। আর সেসব কী সাংঘাতিক ভুল তা ভাবা যায় না। বাঁশ গাছের অঙ্কটার আসল উত্তর হল পঁচিশ মিনিট, গুপির হয়েছিল সাড়ে পাঁচটা বাঁদর। অমলবাবু তাই নিয়ে ওকে যা নয় তাই সব বললেন-টললেন। গুপি শুধু অন্যমনস্কভাবে হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

টিফিনের সময় আমাকে বলল, 'এই, ঝাল মটর খাবি?' আমি একটু অবাক হচ্ছি দেখে কাষ্ঠ হেসে বলল, 'দ্যাখ, আসল জিনিসের সন্ধান পেয়ে গেছি। ওসব তুচ্ছ কথায় আমার আর কিছু এসে যায় না।'

এই বলে পকেট থেকে কাগজে-মোড়া একটা ছোট্ট জিনিস বের করল। পুরু ময়লা কাগজে মোড়া, রাংতা দিয়ে জড়ানো একটা গুলি মতন। বললে, 'কী, দেখছিস কী? কাগজটা একবার পড়ে দ্যাখ।'

লাল কালি দিয়ে খুব খারাপ হাতের লেখা। অনেক কষ্টে পড়লাম, 'অন্ধকারে চোখে দেখার অব্যর্থ প্রকরণ।' তারপর গিজিগিজি করে আরও কত যে কী লেখা তার মাথামুণ্ডু বুঝে উঠলাম না।

গুপি গুলিটাকে আবার কাগজে মুড়ে যত্ন করে বুকপকেটে রাখল। বললাম, 'কী ওটা?'

—'কী ওটা! চট করে কি আর বলা যায়? তবে সম্ভবত বাঘের চোখের মণি।'

—'সেকী! তোমার-না বেড়াল দেখলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, ওয়াক আসে, বাঘের চোখের মণি দিয়ে তুমি কী করবে?'

গুপি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে, 'কাকে কী যে বলি! আরে, অন্ধকারে চোখে দেখবার গুণ পাওয়াটা কি যে-সে কথা? পারে সবাই ইচ্ছেমতো জন্তু-জানোয়ার হয়ে যেতে?'

আমি তো অবাক। 'আমার ছোড়দাদু কানের মধ্যে কীসব গান-বাজনা ঝগড়াঝাঁটি শুনতে পেতেন, তারপর অনেক ওষুধ-টষুধ করে তবে সারল; এও সেই নাকি?'

গুপে রেগে গেল। বললে, 'শোন তবে। বড়োদিনের ছুটিতে মামাবাড়ি গেছলুম জানিস তো? প্রত্যেক বছর শীতকালে মামাবাড়ির সামনের মাঠে তিন দিন ধরে মেলা বসে। সে কী বিরাট মেলা রে বাপ! দেখলে তোর মুণ্ডু ঘুরে যেত। কী থাকে না ওই মেলায়, সিনেমা, সার্কাস, হিমালয়ের দৃশ্যের সামনে চার আনা দিয়ে ফোটো তোলা, দু-মুখো সাপ, যাত্রাগান, কুস্তির আখড়া, বাউল নাচ, দোকানপাট, তেলেভাজা, হাত-দেখানো গণক-ঠাকুর— কিছু বাকি থাকে না।

'পাড়ার লোকে সাতদিন দু-চোখের পাতা এক করতে পারে না। দু-দিন আগে থাকতে গোরুগাড়ির ক্যাঁচকোঁচ, গাড়োয়ানদের ঝগড়া, ভিজে ঘুঁটের ধোঁয়া, আর অষ্টপ্রহর ছাউনি তোলার ঠুকঠাক। মেলার তিনদিন তো গান-বাজনা হই-হল্লোড়ে কারো ঘুমুতে ইচ্ছেও করে না। তারপর দু-দিন ধরে ভাঙা হাটে সস্তা দরে জিনিস কেনার সে কী হট্টগোল।

'তারপর যে-যার গোরুগাড়ি বোঝাই করে চলে যায়। মাঠের মধ্যে পড়ে থাকে কতকগুলো উনুন তৈরির পোড়া পাথর, খুঁটি পোঁতার গর্ত, ভাঙা খুরি আর ছেঁড়া চাটাই। কয়েকটি ময়লা কাগজের টুকরো আর শাল পাতার ঠোঙা বাতাসে উড়ে উড়ে পড়তে থাকে। যত রাজ্যের নেড়ি কুত্তোরা এসে কীসব খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ যেন শীতটাও কীরকম ঝেঁপে আসে। সে একবার ওখানে ওই সময় না থাকলে তুই বুঝবিনে।

'তবে যারা মনে করে, মেলা উঠে গেলেই মাঠে আর কিছু বাকি থাকে না, তারা যে কিছু জানে না এই কাগজে মোড়া জিনিসটাই তার প্রমাণ।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলুম। বললুম, 'ও, তুই বুঝি ওটাকে ওই মাঠে কুড়িয়ে পেয়েছিলি, তাই বল। তা এখন ওটাকে নিয়ে কী করতে হবে শুনি?'

গুপি উঠে পড়ে বলল, 'ও! টিটকিরি হচ্ছে বুঝি? থাক তবে।' বলে সত্যি সত্যি ক্লাসে ফিরে গেল।

পরদিন ছিল শিবরাত্রির হাফ হলিডে। ধরলাম ওকে চেপে, 'না রে গুপি, গুলিটার কথা বলতেই হবে। দু-জনে মিলে ওর একটা হিল্লে করে নিতে পারব।'

আসলে গুপিও তাই চায়। বললে, 'বলিনি তোকে আমার মামাবাড়ির নাপিত মেঘলার কথা? রোগা সুঁটকো কুচকুচে কালো মাথায় একটাও চুল পাকেনি, তিরের মতো সোজা, এক-শো হাত দূরে থেকে গাছের ওপর নাকি শকুনের চোখ দেখতে পায়; একদিনে পনেরো মাইল হেঁটে ওর গাঁয়ে গিয়ে আবার সেই দিনই ফিরে আসাকে কিচ্ছু মনে করে না। ওদিকে ও আবার দাদামশাইয়ের বাবারও দাড়ি কামাত। বয়সটা তা হলে ভেবে দ্যাখ।

'তাঁর সঙ্গে নাকি শ্যামদেশে গেছল, সেখানে গভীর বনের মধ্যে কে এক ফুঙ্গি ওকে জলপড়া করে দিয়েছিল, সেই থেকে নাকি ওর শরীর একটুও টসকায় না। গুম-গুম করে নিজের বুকে কিল মেরে বলে, 'তোরাই বল, কোন জোয়ানের শরীরে এর চেয়ে বেশি জোর।' ওই মেঘলাই এই বড়িটাকে কুড়িয়ে পেয়ে আমাকে দিয়েছে।'

আমি বললুম, 'কেন, তোকে দিলে কেন? তুই কিছু করবি ভেবেছে নাকি মেঘলা?'

গুপি খানিক চুপ করে বলল, 'আসল কথা কী জানিস, মেঘলা লিখতে পড়তে জানে না; বড়িটা আসলে কী ব্যাপার বুঝেই ওঠেনি। নইলে কি আর অমনি অমনি দিয়ে দিত ভেবেছিস নাকি। ভীষণ চালাক ওই মেঘলা, বললে, দু-মুখো সাপের ঘরের সামনেটাতে কুড়িয়ে পেয়েছে। বোধ হয় ফেলেই দিচ্ছিল। আমি কাগজটার ওপর একটু চোখ বুলিয়ে, আর কি ওকে হাতছাড়া করি। তখন ব্যাটা আমার কাছ থেকে পঁচিশ নয়া পয়সা নিয়ে, তবে-না আমাকে দিল।'

সত্যি সত্যি বলতে কী, অন্ধকারে দেখতে পাবার আমারও যথেষ্ট ইচ্ছে ছিল। গুপির কাছ থেকে কাগজটি নিয়ে আরেক বার পড়লাম। একটু অদ্ভুত যে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। বললাম, 'আচ্ছা, অন্ধকারে দেখতে পাওয়া মানেই তো অন্ধকারে আমাদের চোখও জ্বলজ্বল করবে? তার কিন্তু মেলা অসুবিধেও আছে।'

—'আছেই তো। তাইজন্যে যদি ভয় পেয়ে যাস তাহলে আর তোর এর মধ্যে এসে কাজ নেই। ভীতুদের কম্ম এ নয়। মেঘলার কাছে শুনেছি, ওর দাদামশাই মেলা মন্ত্রতন্ত্র জানত। যেমন, মানুষকে ছাগল করা, ছাগলকে মানুষ করা, এমনি ধারা কত কী। শুধু বড়িটা গিলে ফেললেই হল না, অত সহজে হলেই হয়েছিল আর কী। নীচে যেসব লেখা আছে তার কোনো মানে বুঝতে পারলি নাকি?'

মনে হল হয়তো সংকেতে লেখা হবেও-বা। কীসব সংখ্যা-টংখ্যা দেওয়া, গোড়াটা এই ধরনের— ৩ উ ১ জো সো ১ সো ১ সো ২ উ মাঝে মাঝে তারা চিহ্ন দেয়া। শুনেছি লন্ডনের বিখ্যাত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেও এইসব গোপন সংকেত পড়বার জন্য মাইনে-করা লোক থাকে। তবু এক বার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী। তা বড়িটা গুপে কিছুতেই দেবে না। শেষপর্যন্ত বড়ি রইল ওর কাছে, কাগজ থেকে লেখাটুকু টুকে নিলাম।

গুপি বার বার আমাকে সাবধান করে দিতে লাগল। 'যা তা একটা কিছু করে বসিসনে যেন। মেঘলার কাছে শুনেছি, ওরই এক মামা এক সাধুর সঙ্গে ভাব করে অন্ধকারে দেখার ওষুধ নিয়েছিল, কিন্তু পয়সা না দিয়েই পালিয়েছিল। তারপর থেকে মামা নিখোঁজ কিন্তু ওদের বাড়ির চারপাশে রোজ রাতে একটা বিরাট প্যাঁচাকে উড়ে বেড়াতে দেখা যেত। বড়িটা তাই আমার কাছেই রাখলুম।'

অনেক মাথা ঘামালাম লেখাটা নিয়ে। আমার পিসতুতো ভাই মাকুদা কবিতা-টবিতা লেখে, তাই নিয়ে প্রায়ই বকুনি-টকুনিও খায়, ওর কাছে বুদ্ধি নিতে গেলাম। অবিশ্যি বড়ি ইত্যাদির কথা একেবারে চেপে গেলাম। বললাম, 'এগুলি একটা ওষুধের অনুপান, কিন্তু সংকেতে লেখা।'

মাকুদা খুব মাথাটাথা নেড়ে খানিক ভেবে বলল, 'এ তো খুব সোজা, দে তো একটু কাগজ পেনসিল!' তারপর কাগজে লিখল তিনটে উট, এক জোড়া সোনার চেন, একটা সোডা ওয়াটার, দুটো উল্লুক এইসব লাগবে আর কী। তারপর পেনসিলটা পকেটে পুরে মাকুদা উঠে পড়ে বলল, ওই পেনসিলটা নাকি ওর। অনেকদিন থেকে পাচ্ছে না। অথচ আমি দস্তুরমতো বসবার ঘর থেকে ওটাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। থাক গে। যখন অন্ধকারে চোখে দেখতে পাব, তখন তো আর কোনো দুঃখ থাকবে না।

ওই লেখা নিয়ে গুপির সঙ্গে খুব একচোট তর্কাতর্কিও হয়ে গেল। ওর এক বন্ধু আছে, ন্যাপলা, মাথাভরা তেল চুকচুকে কোঁকড়া চুল, এমনি একটা গায়ে-পড়া ভাব যে, দেখলেই পিত্তি জ্বলে যায়। আর গুপির তো সে দিনরাত দস্তুরমতো খোশামুদিই করে; তাই দেখে গুপি আবার ওকে একেবারে মাথায় তোলে। ওকে নিয়ে এর আগেও গুপির সঙ্গে আমার অনেকবার হয়ে গেছে। সেদিনও একচোট হল।

গুপি আর লোক পায়নি, তাকে দিয়ে লেখাটা পড়িয়েছে। তার নাকি ভারি বুদ্ধি, নাকি পাশা খেলায় বড়োদের হারিয়ে দেয়। সে লেখা দেখে বলেছে, ওর মানে তিন ফোঁটা উদক মানে জল, এক জোড়া সোনপাপড়ি, একদানা সোহাগা, আরও দু-ফোঁটা উদক দিয়ে গুলে খেয়ে ফেলতে হবে। বুদ্ধিখানা দেখলে একবার। অথচ গুপি গলে জল। ও-রকম বুদ্ধি নাকি কারো হয় না। বেশ একটা রাগারাগির পরে ঠিক হল এখন কিছু করা নয়, এক্ষুনি স্যার এসে যাবেন বরং সন্ধ্যে বেলা গুপিদের পেয়ারাতলায় যা হবার হবে।

সন্ধ্যে বেলায় গিয়ে দেখি পেয়ারাতলা ভোঁ ভোঁ! জায়গাটা দস্তুরমতো নির্জন, পুরোনো কালের বাগান, ঝোপঝাপে ভরতি। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, দূর থেকে রাস্তার শব্দও

শুনতে পাচ্ছিলাম, আবার কাছ থেকে বাগানের মধ্যেও নানারকম অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল। কে যেন সাবধানে হেঁটে বেড়াচ্ছে, লুকিয়ে থেকে কীসে যেন নিশ্বাস চাপতে চেষ্টা কচ্ছে। বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

ভয়ে ভয়ে ইদিক-উদিক তাকাতে লাগলাম। গুপির কিছু হয়টয়নি তো? গুপিই কিছু হয়নি তো? ওর কাছে তো লেখাটাও ছিল, বড়িও ছিল। যদি ওই ন্যাপলাটার বুদ্ধি নিয়ে বড়ি গিলে বসে থাকে।

হঠাৎ আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। চেয়ে দেখি দূরে রঙিন ঝোপের মধ্যে থেকে এক জোড়া সবুজ চোখ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মাটি থেকে দু-হাত উঁচুতে হবে। কী আর বলব, হাত-পা পেটে সেঁদিয়ে গেল। যাই হোক, গুপির যতই দোষ থাকুক, পুরোনো বন্ধু তো বটে! কিন্তু সবুজ চোখ দুটোতে মনে হল কেমন একটা খিদে খিদে ভাব! গুপিই হয়তো ঝোপের মধ্যে থাবা গেড়ে বসে আছে, আমি একটু নড়লেই হালুম করে—

আর দাঁড়ালাম না। যা থাকে কপালে, পড়িমরি করে ছুট লাগালাম। একেবারে বাড়িতে এসে থামলাম। সেখানেও কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? এ বাড়ি তো ওর চেনা, শুঁকতে শুঁকতে যদি এসে হাজির হয়? জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে হয়তো-বা স্বচ্ছন্দে গলে যাবে।

আস্তে আস্তে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। সবে একটু বসেছি, দরজার বাইরে কীসের শব্দ! ছুটে গিয়ে দরজাটাকে ঠুসে ধরলাম।

বাবা জোর করে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বললেন, 'সন্ধ্যে বেলা তোরা লাগিয়েছিস কী? ওদিকে গুপিদের ওখানে এক কাণ্ড।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'বেঁধে রেখেছে?'

বাবা তো অবাক! 'বেঁধে রেখেছে কী! সে বিরাট এক বাদশাহি জোলাপের বড়ি কীসব দিয়ে খেয়ে একেবারে কুপোকাত! এখন আর নড়বার-চড়বার জো নেই। ওটা নাকি ওর মামাবাড়ির কে এক নাপিত মজা করবার জন্য দিয়েছিল। যে-কাগজে মুড়ে দিয়েছিল, তাতে কী একটা উল বোনার প্যাটার্ন লেখা ছিল। কাকে দিয়ে পড়িয়েছে সেটাকে, কী বলতে কী বলেছে সে, সোহাগা-টোহাগা দিয়ে বড়ি খেয়ে বাছাধন সারা বিকেল ছুটোছুটি। এখন ডাক্তার এসে ঘুমপাড়ানি ওষুধ দিয়েছে। কী, শুয়ে পড়েছিস যে? তোরও কি শরীর খারাপ নাকি!'

কিন্তু গুপিদের পেছনের বাগানে তবে ও কার চোখ?